দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭৩ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা।। ২৮ ডিসেম্বর ২০২০।। ১২ পৌষ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

স্বাধীনতাপ্রেমী মা সারদা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ১৮ সংখ্যা, ১২ পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২৮ ডিসেম্বর - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

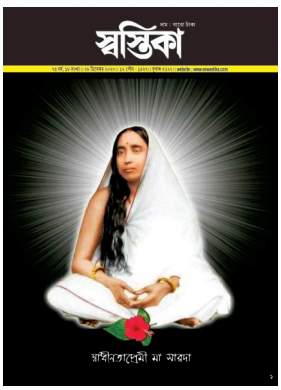

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফ ঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৪

পশ্চিমবঙ্গে মেরুকরণের জন্য দায়ী মমতা ব্যানার্জী

□ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী □ ৫

শ্রীশ্রীমা সারদা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

□ সুতপা বসাক ভড় □ ৮

স্বাধীনতাপ্রেমী মা সারদা

□ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ১০

আদর্শে ধর্মের কোনো একক স্রষ্টা থাকেন না

□ ডা: সুভাষচন্দ্র রায় □ ১২

ধর্ম মানুষের মজ্জাগত, 'ইজম্' সচেতন মনের আমদানি

□ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ১৫

ইউরেটরে স্টোন ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

□ ডা: প্রকাশ মল্লিক □ ১৭

গীতাজয়ন্তী ও ভগবদগীতার তাৎপর্য

□ সৌমিত্র সেন □ ১৮

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ : বর্ণচতুষ্টয় ও শিক্ষা

□ ইন্দুমতী কাটদরে □ ১৯

কৃষকদের বিভিন্ন নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্যই নতুন কৃষি আইন □ চেতন ভগত □ ২১

সংবিধানে অদ্ভুত বৈপরীত্য, বাংলাদেশে ইসলামি শক্তি উত্থান □ ২৩

চিঠিপত্র : ২৬

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আজ প্রকৃত মায়ের বড়োই অভাব

শ্রীশ্রী মা সারদা। এই নামটির মধ্যেই লুকাইয়া রহিয়াছে শাশ্বত ভারতীয় নারীত্বের ব্যঞ্জনা। বর্তমানকালে সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাঁর বড়োই অভাব বোধ করিতেছেন। তাঁরা মায়ের আর একবার এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার আকুল প্রার্থনা করিতেছেন। আজ হইতে দেড়শত বৎসর পূর্বে তিনি পল্লীবাঙ্গলার জয়রামবাটি গ্রামে অবতীর্ণ হন। সেই সময় সমাজ ব্যবস্থা জাতপাত ও প্রবল গোঁড়ামিতে ছিল জরাজীর্ণ। ফলস্বরূপ নানারকম বিধিনিষেধে দেশের নারীজাতি বাঁধা পড়িয়াছিল। স্বাভাবিকভাবেই মা সারদা রক্ষণশীল সমাজের দরিদ্র পরিবারে বাস করিয়াও যথেষ্ট আধুনিকমনস্কা ও উদারমনোভাবাপন্ন ছিলেন। সেই কালের আর একজন আধুনিকমনস্ক ধর্মবিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দৈবীনির্দেশে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তিনি যেন সর্বজনীন মাতৃমূর্তিতে উদ্ভাসিত হইলেন। তিনি হইয়া উঠিলেন সতের মা, অসতেরও মা। বাস্তবিকভাবে হইয়া উঠিলেন সকলের মা। 'পাতানো মা নয়, সত্যিকারের মা'।

সমাজবিদরা বলিতেছেন, আজ যে সমাজজীবনের অবক্ষয় দেখা যাইতেছে তাহার কারণ হইল প্রকৃত মায়ের অভাব। মা হইতেছেন প্রথম শিক্ষিকা। প্রকৃত মা একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছেন, 'সন্তানদের দেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাইবেন মায়েরা।' জীবনের ভালো-মন্দের খুঁটিনাটি শিখাইবার দায়িত্ব মায়েদের উপরেই রহিয়াছে। ভারতবর্ষের শাশ্বত মাতৃত্বের প্রতীকস্বরূপা শ্রীশ্রী মা সারদা। শ্রীশ্রীমা আদর্শ লোকশিক্ষিকা। পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াই তিনি শিক্ষিকা। তিনি স্নেহ ও ভালোবাসায় সবাইকে শিক্ষা দান করিয়াছেন। ভালোবাসার বন্ধনে সমগ্র পৃথিবীকে তিনি বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। সমাজ জীবনের অবক্ষয় রোধ করিতে তাই বর্তমান মায়েদের মা সারদার শিক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে।

মানুষের দুঃখ-কষ্ট শ্রীশ্রীমাকে পীড়িত করিয়া তুলিত। তাই তো তিনি জমিদারের পীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের মেয়েদের প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। দেশের পরাধীনতা তাঁহাকে প্রতি মুহূর্তে পীড়া দিয়াছে। তিনি ঈশ্বরের নিকট অত্যাচারী শক্তির বিদায়ের জন্য প্রার্থনা করিতেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি প্রেমময়ী মাতৃমূর্তি। সেই যুগের রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা তিনি। তাহা সত্ত্বেও তিনি বিদেশিনী কন্যা সারা বুল, সিস্টার নিবেদিতা, মিস ম্যাকলিউডের সহিত একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহাকে জীবন্ত কালী বলিয়া মনে করিতেন। বহু বিপ্লবী যুবক শ্রীশ্রীমার বরদহস্ত স্পর্শে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ সমস্ত শ্রেণীর মানুষ মায়ের ভালোবাসায় ধন্য হইয়াছেন। বহু বৎসর পূর্বের এই দেবীমানবীর জীবন মন্থন করিয়া, তাঁহার উপদেশাবলীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আজ প্রকৃত মানুষ হইবার শপথ লইতেই হইবে। আর ইহাতেই সমস্ত প্রকার অশান্তি দূরীভূত হইয়া সমাজ নির্মল হইয়া উঠিবে।

সুভাষিতম্

অলব্ধমীহেদ্ধর্মেণ লব্ধং যত্নেন পালয়েৎ।

পালিতং বর্ধয়েন্নীত্যা বৃদ্ধং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ।।

অপ্রাপ্ত বস্তু ধর্মপথে প্রাপ্ত করতে হবে, প্রাপ্ত বস্তু যত্নপূর্বক রক্ষা করতে হবে, রক্ষিত বস্তুর নিরন্তর বৃদ্ধির প্রয়াস করতে হবে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধন সৎপাত্রে বিতরণ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে মেরুকরণের জন্য দায়ী মমতা ব্যনার্জি

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের শুরু থেকেই সিপিএম চালকের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। তারা মুখ ও মুখোশের রাজনীতি চালিয়ে যায়। এরা কখনো জনগণের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভাবেনি। কী করে যেনতেন প্রকারেণ নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক বাড়ানো যায়, নামে বামফ্রন্ট হলেও কী করে ফ্রন্টের অন্য দলকে প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত করা যায়, তার জন্য এরা শুরু থেকেই চেষ্টা করতে থাকে। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে নবজাগরণের পুরোধা বাঙ্গালির প্রতিবাদী ও জাতীয়তাবাদী চরিত্র পাল্টে দেওয়া, প্রশাসনকে আপাত স্বচ্ছ দেখিয়ে পার্টি কন্ট্রোল্ড ভাবে চালানো, কৃষকদের রোজগারের পথ বন্ধ করে সিন্ডিকেট ও দালালরাজের পার্টি কন্ট্রোল্ড চক্রে তাদের ফেলে দেওয়া, কলকারখানা ও অন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে পার্টির আধিপত্য কায়েম করা যা ইউনিয়ানবাজির চূড়ান্ত কুৎসিত সংস্করণ। এগুলি কমিউনিস্ট দেশে হয়, কিন্তু ভারতের মতো একটি দেশের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে এটা করা শক্ত। এখানেই সিপিএমের কন্ট্রোল্ড দমননীতির সার্থকতা। এর সঙ্গে যত পপুলারিটি কমতে লাগল তত শুরু হলো রিগিং-নির্ভর নির্বাচন। শুধু পেশিশক্তি নয়, পুলিশ, প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে, প্রলোভনের ফাঁদ ও অন্যান্য সব পদ্ধতি প্রয়োগে বামফ্রন্ট ধীরে ধীরে রিগিংকে institutionalize করল। একে অন্যেরা সায়েন্টিফিক রিগিং বলত। সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে বন্ধ ও কর্মনাশা ধর্মঘট করিয়ে এবং আরও বিভিন্ন রকমভাবে কর্মচারীদের ফাঁকিবাজিতে উৎসাহ দেওয়া হলো,। শুধু বিনিময়ে পার্টির হয়ে কাজ, একটুতেই কর্মনাশা চরিত্র সিলমোহর পেল। ঘেরাও ও বন্ধের রাজনীতিকে প্রত্যক্ষ মদত জুগিয়ে একের পর এক শিল্প, কারখানা, ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হলো। এর সুদূরপ্রসারী ফল হলো শ্রমিকের মনে মালিকের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ, যা বাঙ্গালির কর্মনাশা চরিত্র চিত্রণে সুবিধা করে দিল। সরকারি ও আধা সরকারি, শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে নিয়োগের একমাত্র মাপকাঠি হলো দলীয় আনুগত্য। সিপিএম যে শরিক দলকে কোনো গুরুত্ব দেয় না তার প্রমাণ ১৯৭৯-র মরিচঝাঁপি গণহত্যা। রাম চট্টোপাধ্যায় জ্যোতি বসুর মৌখিক সমর্থনে দণ্ডকারণ্য থেকে হিন্দু বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের নিয়ে এসে মরিচঝাঁপিতে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করলেন। সিপিএমের চিন্তা অন্যরকম থাকায় তারা ওই উদ্বাস্তুদের আলটিমেটাম দিয়ে তাদের খাবার রসদ, জল সব বন্ধ করে দিল। চরম অমানবিক পরিস্থিতিতেও ওই সর্বস্বান্ত মানুষগুলো হার স্বীকার করে ফিরে না যাওয়ায় তাদের গুলি করে মারা হয়। এরপর হয়তো অনুশোচনায় রাম চট্টোপাধ্যায় আর বেশিদিন বাঁচেননি। জ্যোতি বসুর সময়ে এই নারকীয় গণহত্যা একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। ধামাধরা বুদ্ধিজীবী যারা ১০০ শতাংশ রিডাকসান সেলে বিক্রি হন, তাঁরা এসব বলেন না। এই ইতিহাসেও পড়ানো হয় না।

এদিকে, শিক্ষার মানের চরম অবমূল্যায়ন, শিল্পক্ষেত্রগুলিকে নষ্ট করে অভূতপূর্ব বেকারত্ব বৃদ্ধি মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি করল। কৃষিক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকার বর্গাদারি প্রথায় জমি বণ্টন শুরু করলেও এরা তা শেষ করে ক্রেডিট নিল। কিন্তু এটা পরবর্তী সময়ে ব্যুমেরাং হয়ে গেল। কারণ কৃষি জমিগুলি ছোটো ছোটো ব্যক্তি মালিকানায় ভাগ হওয়ার ফলে চাষের আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ এখানে করা গেল না। আবার পার্টি কন্ট্রোলে অসুবিধা হবে ধরে নিয়ে কৃষি ও অন্যান্য ব্যবসায় সিপিএম কোঅপারেটিভ আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গে বাড়তে দিল না। ফলত, অনুন্নত সেচ ব্যবসা ও পুরানো পদ্ধতির কৃষিকাজে বিঘা প্রতি ফলন বিশেষ বাড়ানো গেল না। আবার দখলের রাজনীতি করতে গিয়ে সিপিএম কয়েকটি ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করল। সর্বহারার নেতৃত্বের কথা বলে কাজে একনায়কতন্ত্র চালানো কোনো দেশে সম্ভব হলেও একটি গণতান্ত্রিক দেশের অঙ্গরাজ্যে তা সম্ভব নয়। ফলে, ক্রমহ্রাসমান রোজগার ও সংকুচিত সুযোগ যাতে মানুষকে বিক্ষুব্ধ ও বিরোধী না করে তোলে তার জন্য বড়ো সংখ্যায় পার্টির ক্যাডার পঞ্চায়েতের ব্যবস্থায় সায়েন্টিফিক রিগিংয়ের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণ পার্টির হাতেই থাকল। শিক্ষা জগতে সম্পূর্ণরূপে পার্টিতন্ত্র কায়েম হলো। উপাচার্যদের উপর পার্টির খবরদারি ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হলো। ছাত্রদের পড়াশোনা অপেক্ষা পার্টিবাজিতে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ দেখিয়ে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কেই পার্টির ছত্রছায়ায় ক্যাডার হিসেবে বিবেচনা করা হতে লাগল। শুধু চাকরিতে নিয়োগই নয়, প্রমোশনেও পার্টি আনুগত্য একমাত্র বিবেচ্য হিসেবে গণ্য হতে লাগল। ফলে, দেশের এক সময়ের সবচেয়ে নামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎকর্ষতার বিচারে সাধারণ মানে নামিয়ে আনা হলো। প্রশাসনে কর্মচারীদের মধ্যে দলগত প্রাধান্য বজায় রাখতে ডিএ বাড়ানো ও অটোমেটিক প্রমোশানের রাস্তা খোলা হলো। উৎকর্ষতার বদলে আনুগত্য বিবেচনায় এলো।

এইভাবে একটা সময়ে গণ-অসন্তোষ যখন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মুখোশের আড়ালে নকল যুদ্ধ করেও ঠেকানো যাচ্ছে না, 'কভি খুশি কভি গম' নীতি নিয়ে কেন্দ্রে দোস্তি আর রাজ্যে কুস্তি মার্কা কেন্দ্রের বঞ্চনার ভাঙা রেকর্ড বাজানো চলছে, তখন দুটি কারণ বামফ্রন্টের পতন সুনিশ্চিত করে। (১) জ্যোতি বসু একজন সুদক্ষ রাজনৈতিক manipulator ছিলেন। তিনি কেন্দ্রের সঙ্গে এই খেলাটা খেলেও রাজ্যের মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখতে পারতেন। তাকে সরিয়ে বাস্তবজ্ঞানশূন্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে মুখ্যমন্ত্রী করা। (২) পার্টির শক্তিশালী সিন্ডিকেট লবির কথা মেনে কুখ্যাত সালিমগোষ্ঠীকে নন্দীগ্রামের চাষের জমি দেওয়া এবং টাটাদের গাড়ির কারখানার জন্য সিঙ্গুরের চাষের জমি দেওয়া। তারপরেও কেন্দ্রের সঙ্গে কুস্তি লড়ে প্রথম মনমোহন সিংহ মন্ত্রীসভা থেকে সমর্থন

প্রত্যাহার।

ভূমি সংস্কারের পর পশ্চিমবঙ্গে এক লপ্তে বড়ো শিল্পের জন্য জমি পাওয়া দুঃসাধ্য নয়, অসম্ভব। তার ওপর সরকারের কোনো ল্যান্ড ব্যাঙ্কও নেই। একমাত্র যে শিল্পগুলিতে পার্টির দৌলতে লালবাতি জ্বালানো হয়েছে তেমন জমি ভাবা যেতে পারত। এতে পুরোনো মালিকদেরও সুবিধা হতো। কিন্তু পার্টির শক্তিশালী সিন্ডিকেট লবি তখন এইগুলি হস্তগত করে প্রমোটারিতে ফ্ল্যাট বানাচ্ছে বা তার পরিকল্পনা করেছে। ততদিনে পার্টির বিভিন্ন লবি পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই সময় মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হলো। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই আন্দোলন থামাতে ব্যর্থ হলেন। আবার মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের শরিক হয়ে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কোয়ালিশন সরকারের লোভ দেখালেন। ২০১১-র নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থন না পাওয়ায় সিপিএমের রিগিং মেশিনারি সেভাবে কাজ করতে পারল না। সঙ্গে জমি আন্দোলনের জেরে বামফ্রন্ট নামধারী সিপিএমের পতন হলো। রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন মমতা ব্যানার্জি।

এতদিন যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তাদের কোনো রাজনৈতিক দল মনোনয়ন দিয়েছে আর প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ঘোষিত নীতি থাকে। অবশ্য এই রাজ্যের ক্ষেত্রে অঘোষিত বা লুক্কায়িত নীতিকেই অধিক গুরুত্ব পেতে দেখেছি। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি যে দলটার নেত্রী তার শুরু থেকেই কোনো রাজনৈতিক দল হিসেবে চলার অভিজ্ঞতা বিশেষ ছিল না। ফলে দলটা একনায়কতন্ত্রীর খোলসে খব দ্রুত ঢুকে পড়ল। এই দলের নীতি নির্ধারক একজন। তিনি প্রকাশ্যেই বলেন এবং দলের নেতা-কর্মীরা তা অনুসরণ করে বলেন তারা মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় সব কাজ করেন। এই 'অনুপ্রাণিত' সরকারের সর্বাধিনায়িকা মুক্তকণ্ঠে বার বার বলেন সব নির্বাচনের সব আসনে তিনিই একমাত্র প্রার্থী, তাঁকে দেখেই মানুষ ভোট দেন। অর্থাৎ তিনিই একমাত্র পোস্ট, বাকি সব ল্যাম্প পোস্ট। এভাবে স্বৈরাতন্ত্রী একনায়কের সর্বদা মুখ ও

মমতা ব্যানার্জিই তৈরি করেছেন। অসাদুদ্দিন ওবেসি শুধু সেই ক্ষেত্রে তার রাজাকার বাহিনী নিয়ে রাজ্যে রাজনৈতিক প্রভাব বানাতে চাইছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান ভোটারদের ভোট মুসলমান হিসেবে পাওয়ার জন্য যে সাম্প্রদায়িক কার্ড মমতা ব্যানার্জি খেলছেন তার ফল তাঁকে ভোগ করতেই হবে।

মুখোশের রাজনীতির দরকার হয়। মমতা ব্যানার্জির ওপর রাজ্যের সাধারণ মানুষ অশুভ বাম শক্তিকে সরানোর জন্য এতটাই কৃতজ্ঞ ছিল যে প্রথম পাঁচ বছর তারা অপেক্ষা করেছে। বঙ্গ রাজনীতির এক প্রবীণ নেতা যথার্থই বলেছিলেন, 'মমতা সিপিএমের মেধাবী ছাত্রী'। ২০১৬-তে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর মমতা ব্যানার্জির একনায়কতন্ত্রী শাসনের শৃঙ্খল আরও শক্তভাবে চেপে বসল। এই পর্যায়ে তিনি দল ও সরকারকে সমার্থক করে প্রশাসনকে সর্বতোভাবে দলীয় কাজে নিযুক্ত করলেন। খসে পড়ল মুখোশ।

একটি অদ্ভুত ব্যাপার, তিনি 'দুয়ারে সরকার' নাম দিয়ে জনসাধারণের কাছে তার দলের কাজকর্মে সীমাবদ্ধতার পরিমাপ করার প্রকল্প চালু করলেন। এখানে সরকারি ও সরকার পোষিত সংস্থার কর্মচারীরা অংশ গ্রহণ করছেন। কাজটা কিন্তু তার দলের। ওনার কাছে 'দুয়ারে সরকার' ও 'দুয়ারে দল' সমার্থক। এর সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো হিটলারের মতো পপুলার স্লোগান আওড়ানো যা আক্ষরিক অর্থে কোনোদিনও বাস্তবায়িত হয় না। হয়তো প্রথমদিকের মুখ্যমন্ত্রীদের সৎ ও সাধারণ জীবনযাপন মানুষ পছন্দ করতেন বলে জ্যোতি বসু ও তারপরে মমতা ব্যানার্জি ওই সৎ ও সাধারণ জীবনের ভড়ং দেখান। জ্যোতি বসু যেমন তার শিল্পপতি পুত্রের কথা উঠলেই প্রশ্নকর্তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন, একই রকমভাবে মমতাও তার ভাইপোদের কথায় প্রশ্নকর্তাকেই অপদস্ত করেন। মমতা ব্যানার্জির অসহিষ্ণুতা, রাজনৈতিক শিষ্টাচার-বহির্ভূত কটুকথা ও ডিক্টেটর সুলভ দম্ভোক্তি তার নিজের এবং দলের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ার একটি কারণ বটে। জ্যোতি বসুর সময়ে তার রাজনৈতিক দ্বিচারিতা করার যে সুযোগ ছিল, এখন অত্যন্ত শক্তিশালী সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে তা করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু বামফ্রন্টের একটি শক্তিশালী দলীয় সংগঠন ছিল । মমতার তেমন সুযোগ নেই। তিনি প্রথমে কংগ্রেস ভেঙে, পরে অন্য দল ভেঙে, ও কিছু স্বার্থান্বেষী লোকজন নিয়ে তার তৃণমূল দল তৈরি করেন। অবশ্য এই দলের সিপিএম বিরোধিতা ছিল নিখাদ। যখন সিপিএম ক্ষমতা থেকে সরে marginalized হয়ে গেল তখন দলের কাজ ফুরোলো। সুতরাং মমতা ব্যানার্জির সামনে কোনো নীতির লড়াই না থাকায় তিনি শুধুই নিজের গদিকে নিষ্কণ্টক করার কাজে নিয়োজিত হলেন। তার জন্য প্রথমে তিনি পুলিশের থানাভিত্তিক অনুগত পুলিশ তৈরিতে মনোনিবেশ করলেন। পরিষ্কার অলিখিত নির্দেশ ছাড়া ওই লেভেলের পুলিশ কর্মীদের পুরস্কার-তিরস্কারের নিগড়ে বাঁধা যায় না। তাই এভাবেই তিনি পুলিশ বাহিনীকে 'দলদাস' পুলিশ বাহিনীতে পরিণত করলেন।

২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে যেসব পুলিশ অফিসারের এলাকায় নিরপেক্ষভাবে কাজ হয়েছিল, সকলকেই ভোট-পরবর্তী সময়ে দূরবর্তী, কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বদলি করা হলো। দুজন আইপিএস-কে অফিসার-অন-কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে পাঠানো হলো। IAS ও IPS মহল পরিষ্কার সিগন্যাল পেল। পুরো পশ্চিমবঙ্গের সরকারটাই দলদাসে পরিণত হলো। সমস্ত সরকারি প্রকল্প এমনভাবে নেওয়া হলো যে, মোটা পারসেন্টেজ মানি ব্যক্তি বা

ব্যক্তিগোষ্ঠীর কাছে যায়। এমনকী আদালত এই সন্দেহ প্রকাশ করে কিছু ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের আদেশও দিয়েছেন। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল খোলা হলো পর্যাপ্ত infrastructure-এর ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই। রেশনের চাল, ত্রাণের টাকা ইত্যাদিও হাপিস হতে লাগল। প্রথমে লোকমুখে ও তারপর মুখ্যমন্ত্রী নিজেই একে 'কাটমানি' বললেন। দলের লোকেদের কাটমানি ফেরত দিতে বললেন। যারা কাটমানি নিল, তাদের শাস্তি তো দূরের কথা, তিরস্কার অব্দি করা হলো না। সরকার ও সরকার পোষিত সমস্ত সংস্থায় নিয়োগবিধি ও নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে সব 'সিভিক' কর্মচারী নিয়োগ হতে লাগল অস্থায়ী ভাবে। একজন কনস্টেবলের মাইনে ট্রেনিং শেষে পঁচিশ হাজার টাকা হলে একজন বিনা ট্রেনিংয়ের সিভিক পুলিশ পাঁচ-ছ' হাজার মাইনেতে দলদাস হিসেবে নিয়োগ করা যায়। এভাবেই সিভিক শিক্ষক, সিভিক ডাক্তার, সিভিক অধ্যাপক অর্থাৎ sact 1ও sact 2 থেকে সিভিক করণিক, সিভিক গ্রুপ ডি-পুরো গভর্নমেন্টটাই 'সিভিক' নিয়োগে চলতে লাগল। দুর্জনেরা বলে, এইসব বেআইনি নিয়োগে কাটমানির আমদানি ভালোই। যে নিয়োগ নিয়েই আদালতে মামলা হয় তাতেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গলদ বেরিয়ে পড়ে। মনে হয়, মাইনে কম দিয়ে বাঁচানো টাকায় 'উন্নয়ন' করলে কাটমানি বেশি আসে। কিন্তু এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হওয়ায় জনরোষ বাড়তে থাকে। সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য মাত্রাছাড়া জায়গায় পৌঁছানোর জন্য ছোটো বিনিয়োগ কমে গেল। এদিকে 'সিভিক' নিয়োগে কাজের মানের চরম অবমূল্যায়ন হলো। প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সবজান্তা মনোভাবে অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে লাগল। সমস্ত প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বিরোধী আন্দোলন সব 'দলদাস' পুলিশ ও তাঁবেদার সংবাদমাধ্যমের দৌলতে ভেঙে দেওয়া হতে লাগল। এদিকে অর্ধশিক্ষিত নেতায় পূর্ণ দলের বিভিন্ন নেতার বিবৃতি শুধু যে কুরুচিকর তাই নয়, জনমানসে বিকৃতিরও উদ্রেক করছে। এর একটি বড়ো কারণ, নেত্রীর নিজের অসংযত কথাবার্তা। আর যে দলে স্তাবকতা একমাত্র যোগ্যতার মাপকাঠি, সেই দলে 'বাবু যত বলে, পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ' মন্ত্রে কুকথার ফুলঝুড়ি তো ছুটবেই। এতে কিন্তু তারা নিজের দলেরই বেশি ক্ষতি করছেন। এই মুখ-মুখোশের রাজনীতি করতে গিয়ে মমতা ব্যানার্জি কয়েকটি কারণে দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাতে লাগলেন। রাজ্য প্রশাসনের মতো শক্তিশালী মিডিয়ার সর্বময় কন্ট্রোল না নিতে পারা, কেন্দ্রে দোস্তি রাজ্যে কুস্তির সফল প্রয়োগ না করতে পারা, শক্তিশালী দলীয় সংগঠন না থাকায় প্রশাসন ও পুলিশের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, করোনা ও আমফান মোকাবিলায় ব্যর্থতা ইত্যাদি এরকম কয়েকটি কারণ। শেষে একটি কথা বলে প্রতিবেদন শেষ করব। আসাদুদ্দিন ওবেসির পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আসার কারণ অনেক খোঁজার চেষ্টা করলেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে সরাসরি মেরুকরণের ক্ষেত্রটি মমতা ব্যানার্জিই তৈরি করেছেন। অসাদুদ্দিন ওবেসি শুধু সেই ক্ষেত্রে তার রাজাকার বাহিনী নিয়ে রাজ্যে রাজনৈতিক প্রভাব বানাতে চাইছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান ভোটারদের ভোট **মুসলমান হিসেবে** পাওয়ার জন্য যে সাম্প্রদায়িক কার্ড মমতা ব্যানার্জি খেলছেন তার ফল তাঁকে ভোগ করতেই হবে। সুতরাং এই মুখ ও মুখোশের রাজনীতি থেকে রাজ্যের মানুষ যত তাড়াতাড়ি বের হতে পারবে ততই দেশ ও রাজ্যের মঙ্গল। □

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

শ্রীশ্রীমা সারদা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

সুতপা বসাক ভড়

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ছিলেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সার্থক সহধর্মিণী। রামকৃষ্ণ মিশনের 'সঙ্ঘজননী'। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পরে শ্রীমা'র ইচ্ছামাত্রকেই সন্তানরা অমোঘ আদেশ মেনে পালন করেছেন। তাঁর জন্ম ও জীবনলীলার সময় ভারতের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এইসময় ব্রিটিশদের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য বঙ্গপ্রদেশ তথা সমগ্র ভারত উত্তাল হয়ে উঠেছিল। জন্ম নিয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন। জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বেলিত সমগ্র দেশের চেতনায় একটি মানুষ ক্রমাগত অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আপামর দেশবাসী তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। যাঁর আদর্শ ও কর্মের অনুপ্রেরণা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদা। শ্রীমার অনুমতি ও আশীর্বাদ সহায় করে তিনি শিকাগো ধর্মসভার উদ্দেশে যাত্রা করেন।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি সেখানকার ধর্মসভায় বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকার শিক্ষিত জনগণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি সনাতন ধর্ম ও ভারতভূমির প্রতি আকর্ষণ করেন।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর The Master as I saw Him-এ লিখছেন, শ্রীমা হলেন ভারতীয় নারীর পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি ও নতুন আদর্শের অগ্রদূত। রক্ষণশীল গ্রাম্য ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর জীবনযাত্রার মধ্যে তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছেন যা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাস্পৃহা এই দুটি দিক ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইংরেজ শাসন তিনি ঘোরতর অপছন্দ করতেন। ভারতের দুঃখ- দুর্দশা, অভাব-অনটনের মূল যে তারা, একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। একবার শ্রীশ্রীমার কোয়ালপাড়ায় বসবাসকালীন বদনগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কথা প্রসঙ্গে মাকে বললেন, 'ইংরাজ সরকার আমাদের দেশের অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়েছে। মা বললেন, 'কিন্তু বাবা, ওইসব সুবিধা হলেও আমাদের দেশের অন্ন-বস্ত্রের অভাব বড়ো বেড়েছে। আগে এত অন্নকষ্ট ছিল না।' (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয়ভাগ পৃষ্ঠা-১৮৫)

একবার শ্রীমা বললেন, 'শুধু স্বদেশী করে কী হবে? আমাদের যা কিছু সবার মূল ঠাকুর, তিনিই আদর্শ।' এর অর্থ আধ্যাত্মিকতাই হলো সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন ও গঠনমূলক কর্মের কেন্দ্র। একথা অমোঘ সত্য যে আধ্যাত্মিকতাই ছিল ভারতীয় চরমপন্থী নেতাদের কাছে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন। প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য, বেদ, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি চরমপন্থী নেতাদের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল। এ প্রসঙ্গে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ বললেন, 'জাতীয়তা কেবলমাত্র নিছক একটি রাজনৈতিক কার্যক্রম নয়, জাতীয়তা হলো ঈশ্বরপ্রদত্ত একটি ধর্ম। তোমরা যদি জাতীয়বাদী হতে চাও, তোমরা যদি জাতীয়তার ধর্ম গ্রহণ করতে চাও, তাহলে সেই ধর্মীয় ভক্তি নিয়ে অগ্রসর হও। মনে রেখো, তোমরা হলে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রমাত্র।' (Sri Aurodindo, Vol. I, 1972, P. 652-53) শ্রীরবিন্দ ঘোষ এবং তৎকালীন জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবীদের হৃদয়ে সমাহিত ছিলেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীরা প্রায় সবাই ছিলেন স্বামীজীর বাণী ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। স্বামীজীর দেহাবসানের পরে তাঁরা আশ্রয় ও ভালোবাসার সন্ধানে শ্রীমা সারদার চরণে প্রণিপাত করতেন। সঙ্ঘজননীকে প্রণাম করে দেশমাতৃকার কাজে আত্মনিয়োগ করতেন।

১৩৯৩ সালের ১০ চৈত্র ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বরাজ পত্রিকায় লিখছেন, 'যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে, তো একদিন সেই রামকৃষ্ণ-পূজিত লক্ষ্মীর চরণ-প্রান্তে গিয়া বসিও ও তাঁহার প্রসাদ কৌমুদীতে বিধৌত হইয়া রামকৃষ্ণ শশিসুধা পান করিও— তোমার সকল পিপাসা মিটিয়া যাইবে।'

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় (১৯০৫-১১ খ্রিস্টাব্দ) অনেক তরুণ যুবক বিপ্লবী বেলুড়মঠে আসতেন, নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। এঁদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেন (স্বামী চিন্ময়ানন্দ), দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ), নগেন্দ্রনাথ সরকার (স্বামী সহজানন্দ), নিতাই দাস (স্বামী বলদেবানন্দ), ধীরেন দাশগুপ্ত (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ), রাধিকা গোস্বামী (স্বামী সুন্দরানন্দ), প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ), অতুল গুহ (স্বামী অভয়ানন্দ— 'ভরত মহারাজ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বাশ্রমে এঁরা অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। অন্তরীণ জীবন বা কারাবাসের অভিজ্ঞতাও প্রায় সকলেরই ছিল এবং সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এঁরা প্রত্যেকেই শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্র-দীক্ষিত ছিলেন।

ব্রিটিশ অত্যাচারে ক্রোধিতা হয়ে শ্রীমা বললেন, 'জান, ইংরেজের পতনের দিন এগিয়ে এসেছে। দেরি নাই। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সব জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যে রাজ্যে নারী নির্যাতন চলেছে, সে রাজত্বের ধ্বংসের দেরি নাই।'
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা স্মৃতি— সম্পাদনা : সুজিত নাগ, ১৩৭৮, পৃষ্ঠা-৩২৬-২৭)

বিপ্লবীকার্য, রাজনীতি, গণ-আন্দোলন, সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীমুক্তি, স্বদেশী, অস্পৃশ্যতা দূর করতে তাঁর অবদান ছিল। স্বামীজী বলেছিলেন, 'মাতাঠাকুরানী ভারতে এসেছিলেন 'মহশক্তিকে জাগ্রত করতে'। 'তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।'

অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট শ্রীশ্রীমার বাণী সত্যে পরিণত হলো, 'আগে ওদের ধ্বংস হবে— নিজেদের রাজ্য নিজেদের হবে।'

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

স্বাধীনতাপ্রেমী মা সারদা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

ওরা কবে যাবে গো, কবে যাবে?

মা সারদার আকুল আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। যে মা বলতেন, ইংরেজও তো আমার সন্তান। সে ধ্বংস হোক আমি বলি কী করে? সেই মা-ই পথেঘাটে স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচার হচ্ছে শুনে এমন আকুল ভাবেই কেঁদেছিলেন সেদিন।

মা সারদা মনেপ্রাণে ছিলেন স্বাধীনতা প্রিয়। সে স্বাধীনতা আত্মার, সত্তার। সে স্বাধীনতা ব্যক্তির। তাই কলকাতায় থাকাকে মনে হতো খাঁচায় থাকার মতন। জয়রামবাটি নয়, কোয়ালপাড়ায় এলেই তিনি যেন পেতেন স্বাধীনতার স্বাদ। স্বাধীনতা ছিল তাঁর আত্মার সংগীত। তাই তিনি বলতেন, 'এ আমাদের পাড়াগাঁ। কোয়ালপাড়া আমার বৈঠকখানা। আমি এদেশে এলে একটু স্বাধীনভাবে চলব, ফিরব, কলকাতা থেকে এলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তোমরা তো সেখানে খাঁচার মধ্যে পুরে রাখ। আমাকে সবসময় সংকুচিত হয়ে থাকতে হয়। এখানেও যদি তোমাদের কথামতো পা-টি বাড়াতে হয়, তা আমি পারব না।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বস্ত্রের অভাবে নারীর নারীত্ব গচ্ছিত হচ্ছে শুনে মা সমবেত ভক্তমণ্ডলীর সামনে বারবার বলতে থাকলেন, 'ওরা কবে যাবে গো, কবে যাবে?'

বলতে বলতেই আত্মস্থ হলেন। ব্যস্ত হলেন আত্মানুসন্ধানে। তাই মুহূর্তেই বলে উঠলেন, এর জন্যও দায়ী আমরা। আমরা যদি আমাদের সম্পদকে ধরে রাখতাম, আমরা যদি আমাদের কুটিরশিল্পকে ধরে রাখতাম তাহলে কার সাধ্য আমাদের সংকটে ফেলে।

সেদিন তিনি বেশ জোর গলাতেই বলেছিলেন, 'তখন ঘরে ঘরে চরকা ছিল, ক্ষেত্রে কাপাস চাষ হতো। সকলেই সুতো কাটত, নিজের কাপড় নিজেরাই করিয়ে নিত, কাপড়ের অভাব ছিল না। কোম্পানি এসে সব নষ্ট করে দিলে। কোম্পানি সুখ দেখিয়ে দিলে— টাকায় চারখানা কাপড়, একখানা ফাউ। সব বাবু হয়ে গেছে— চরকা উঠে গেল, এখন সব কাবু হয়েছে।'

সে সময় কোয়ালপাড়া আশ্রমে তাঁত ও চরকার কাজ চলছিল জোর কদমে। দেখে শুনে মা বলেন, আমায় একখানা চরকা যদি দাও তো আমিও সুতো কাটি।

মায়ের এই উৎসাহে কোয়ালপাড়া আশ্রমে চরকা আর তাঁত বোনার যেন ধুম পড়ে গেল। স্বামী পরমেশ্বরানন্দর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, তাঁরা একটি কাপড় বুনে মা-কে দিলে তিনি আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। খুব ভালো বুনন না হওয়া সত্ত্বেও মা সেটি পরেন। এমনই ছিল তাঁর স্বদেশ ও সন্তান প্রীতি।

দেখা যাচ্ছে, মায়ের ওই স্বদেশ প্রীতি ও ভাবনা তাঁর বহু সন্তানকেই অনুপ্রাণিত করেছিল। পথও দেখিয়েছিল। তবে মায়ের এই দেশপ্রীতি কোনো সময়ই তাঁর মাতৃভাবকে আবৃত করতে পারেনি। মায়ের কয়েকজন বিপ্লবী সন্তান ইংরেজের অন্যায় অত্যাচারের কথা শুনিয়ে মা-কে বলেন, 'মা, তুমি একবারটি মুখ দিয়ে বলো, 'ইংরেজ উচ্ছন্নে যাক'। সন্তানদের মর্মজ্বালা অনুভব করেও মা কিন্তু বলেছিলেন, মা হয়ে আমি মানুষকে উচ্ছন্নে যেতে বলব কী করে। ইংরেজ কি আমার সন্তান নয়? আমি বলি সকলেরই কল্যাণ হোক।

এই হলো মায়ের কল্যাণীমূর্তি। সবসময় চেয়েছেন জগতের কল্যাণ। তবুও কেন মানুষের কল্যাণ হয়নি, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। উত্তরে বলা হয়, মানুষের কৃতকর্মই ডেকে আনে তার সর্বনাশকে। ইংরেজদেরও ঘটেছিল তাই। সীমাহীন অত্যাচার, শোষণ এবং অন্যায়ের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের পতন ডেকে আনে। সেই পতন কিন্তু মায়ের দিবদৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাই মুখে ইংরেজের অমঙ্গল না চাইলেও অন্তরে দেখেছিলেন তাদের অনিবার্য পতন।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে ইংরেজ পুলিশের বর্বর অত্যাচার নেমে আসে। বদনগঞ্জেও সত্যাগ্রহীদের উপর চলে ওইরকম অত্যাচার। সে কথা শুনে তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল এক অমোঘ ঘোষণা, **পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ধ্বংস হবে এই ইংরেজ রাজত্ব।**

ক্রোধে আরক্ত মা বলেন সেদিন,

ইংরেজের পতনের দিন এগিয়ে এসেছে। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সব জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যে রাজত্বে নারী নির্যাতন চলছে, সে রাজত্বের পতনের দেরি নেই। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়। এই কথা শুনিয়ে মা প্রশংসা করেন স্বদেশী আন্দোলনের। বলেন, আগে ইংরেজের ধ্বংস হবে, পরে নিজেদের রাজ্য হবে।

কেবল স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন নয়, মা সারদা ছিলেন বিপ্লবীদের পরম আশ্রয়স্থলও। বিপ্লবীদের অনেকেই তাঁকে প্রণাম করে ঝাঁপিয়ে পড়ত মুক্তি সংগ্রামে। অন্যান্যদের মধ্যে বাঘা যতীনও ছিলেন তাঁর পরম ভক্ত। স্বৈরাচারী ইংরেজের অত্যাচারে সারা দেশকে জর্জরিত হতে দেখে মা বলতেন, ঠাকুর যখনই আসেন, তখনই এমন হয়। আরও কত কী হবে। ওদের ধ্বংস হবে, নিজেদের রাজ্য নিজেদেরই হবে। বিপ্লবীদের ওপর পুলিশের নৃশংস অমানুষিক অত্যাচারের কথা শুনে মা সখেদে বলেন, হে ঠাকুর, আর কতদিন— কতদিন তুমি এই সরকারের অনাচার সইবে?

উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ সকলের প্রতিই ছিল তাঁর সমান টান। বিপ্লবীদেরও তাই মা টেনে নিতেন বুকে। তাঁদের সংগ্রামকে করেছেন সমর্থন। তাঁর ঐশীশক্তির সঞ্চারে তা হয়েছে বলবতীও। কিন্তু বিপ্লবের নামে রাজনৈতিক ডাকাতি বা হত্যাকে সমর্থন করতেন না তিনি। তাই অকাতরে সকলকে দীক্ষা দিয়েও স্বদেশী ডাকাতির সঙ্গে যুক্তদের দীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ছিল তাঁর দ্বিধা। এক্ষেত্রে উপযুক্ত জামিনদার পেলেই দীক্ষা দিতে রাজি হতেন, অর্থাৎ সদাচরণের সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি পাবার পরেই তিনি দিতেন দীক্ষা। স্বদেশী আন্দোলন এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও ধ্বংস নয়, মা ছিলেন গড়ার দিকে। তাই বলতেন, শুধু স্বদেশী করে কী হবে? আমাদের যা কিছু সবার মূল যে ঠাকুর, তিনিই আদর্শ। যা কিছু করো না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে, কোনো বেচাল হবে না।

মা মনে করতেন, ইষ্ট নিষ্ঠা যদি না থাকে, তাহলে নিজেকে ঠিক রাখা খুবই কঠিন। তাঁর কথায়, 'শুধু সমাজসেবা ও দেশসেবা নিয়ে সারাজীবন দেহমন শুদ্ধ রাখা কঠিন। গুরুকে ভালোবেসে, ইষ্টকে ভজনা করে কুমার থাকা সহজ। মেয়ে পুরুষ যেই অবিবাহিত থাকবে, ঈশ্বরের পথে চলতে হবে। তাঁকে ভুলে গেলেই নানান গোলোযোগ আসে। আর একটা কথা মনে রাখবে— মেয়েমানুষ থেকে ফারাক রাখবে— সোনার মেয়েমানুষ হলেও সেদিকে ফিরে চাইবে না। তবে ব্রহ্মচর্য রক্ষা হবে।

মায়ের এইসব কথার পিঠেই এক ভক্ত বলেন, মা, স্বামীজী তো দেশের কাজ করতে খুব বলেছেন, দেশের যুবকদের উৎসাহিত করে নিষ্কাম কর্মের পত্তন করছেন। তিনি আজ বেঁচে থাকলে কত কাজই না দেশের হতো।

একথা শুনে মা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, ও বাব্বা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি (ইংরেজ সরকার) কি আর তাকে ছেড়ে দিত! নির্ঘাত জেলে পুরে রাখত। আমি তা দেখতে পারতুম না।

ইংরেজ শাসনের স্বরূপ ও তার মূল্যায়নে মা যে কতটা নির্ভুল তা বোঝা যায় তাঁর এইসব উক্তি থেকেই।

প্রসঙ্গত, মা সারদার এই স্বাধীনতাবোধ কোনো অর্জিত জ্ঞানের কারণে নয়। এই বোধটা তাঁর সহজাত। তিনি ছিলেন এক দিব্য চেতনার অধিকারী। সেই কারণেই প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন ক্রান্তিদর্শী। সাধনার ধনে ধনী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই তিনিও তাঁর সাধনা এবং বৌদ্ধিক চেতনার মাধ্যমেই প্রায় অনায়াসে অনেক বিষয়ের সমাধান করতে পারতেন। তার চেয়েও বড়ো কথা, গর্ভধারিণী জননী না হওয়া সত্ত্বেও আপন মাতৃত্বের কারণেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন জগজ্জননী। সকলের প্রতিই ছিল তাঁর সমান স্নেহ ও মমতা। এই স্নেহ-মমতার কারণেই তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন তিনি সতেরও মা, অসতের মা। তাঁর মাতৃত্ব শুধু তাঁর ভক্ত বা দীক্ষিত সন্তানদের জন্যই ব্যাকুল হতো না, জগতের সমস্ত মানুষ সম্পর্কেই তিনি ছিলেন সমান স্নেহশীলা। সবার মঙ্গল কামনা করতেন তিনি। এ কারণেই তিনি কল্যাণী। বিশ্বজননী, মুক্তিদায়িনী। তিনি সন্তাপহারিণী।

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে তিনি বিদ্যাদায়িনী— সিদ্ধিদাত্রী। তিনি রামকৃষ্ণের আধারশক্তি। তিনি জায়া। তিনি জননী। পরমারাধ্যা দেবী সারদা। আবির্ভাব তাঁর বাঁকুড়ার জয়রামবাটীতে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর। প্রয়াণ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই। কৃষ্ণাপঞ্চমী তাঁর জন্মতিথি। সে হিসেবে ২০২১-এর পাঁচ জানুয়ারি পালিত হবে তাঁর জন্মতিথি উৎসব অন্যান্য জায়গার সঙ্গে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে। ▯

এখন থেকে 'প্রণব' পত্রিকা
অনলাইনেও পাওয়া যাবে—
www.bsspronabpub.com
প্রণব সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য
ব্যবহার করুন—
swamivedanandamaharaj@gmail.com
maharajswaminirmalananda@gmail.com

আদর্শ ধর্মের কোনো একক স্রষ্টা থাকেন না

ডাঃ সুভাষ চন্দ্র রায়

সমস্ত পদার্থের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্ম আছে। সামগ্রিক নিরিখে বলা যায় 'যা ধারণ করে তাহাই ধর্ম'। মানুষরূপী উন্নত প্রাণীর ধর্ম হলো ন্যায়, নীতি, মানবিকতা, মূল্যবোধ এবং প্রকৃতি ও প্রাণীকুলের পক্ষে কল্যাণকর যাবতীয় আদর্শ গুণাবলী বিকশিত করা। বৃহত্তর অর্থে ধর্মবোধ ও আদর্শবোধ সমার্থক। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মতে 'ধর্ম তাই যা সমাজকে রক্ষা করে, বিশ্বকে রক্ষা করে, মনুষ্যত্বকে রক্ষা করে'। মানবিক আদর্শের পরিপন্থী হলে ধর্ম অধর্মে পর্যবসিত হয়। ধর্মবোধকে তাই নিম্নোক্ত কয়েকটি আদর্শ গুণাবলীর সূত্রে ব্যাখ্যা করা যায়।

১। **ঈশ্বর বা সর্বশক্তিমান নিয়ন্ত্রকের অস্তিত্বে বিশ্বাসী :** ক্রমবিবর্তনের পথে গুহাবাসী মানুষ ক্রমশ শিকার করতে শিখল, পাথর ঘষে আগুন জ্বালানো শিখলো, কিন্তু প্রকৃতির হঠাৎ খামখেয়ালি ভয়াল রূপের কাছে তারা তখনও অসহায় । তাদের কাছে হঠাৎ আকাশে বজ্রগর্ভ মেঘ, প্রলয়ঙ্কর বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির ব্যাখ্যা ছিল না। অসহায় সেই মানুষ অতি প্রাকৃতিক শক্তি বা ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ধারণা করল এইসব ঘটনাকে। শুরু হলো পূজাঅর্চার মাধ্যমে সার্বিক কল্যাণার্থে প্রার্থনা। আজও সেই ধারা অব্যাহত।

বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক অজানা রহস্য আজ উন্মোচিত। আমরা জানি হাজার হাজার উজ্জ্বল তারার মধ্যে আমাদের গ্রহের মতো হাজার হাজার গ্রহ লুকিয়ে আছে। তাদেরও উপগ্রহ আছে। সেখানে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে। এই সব গ্রহমণ্ডলী ভয়ংকর টানে কৃষ্ণগহ্বরে বিলীন হচ্ছে। বিপুল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক তথ্য জ্ঞাত হলেও অনেক কিছুই অজানা। বিজ্ঞানী নিউটন তাই বলেন 'জ্ঞান- সমুদ্রতটে নুড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি'।

২। **ধর্মবোধে মানুষ বিশ্বাস করে যে মানুষ এবং সমস্ত প্রাণীকুল ঈশ্বরসৃষ্ট :** প্রাণীকুল ও প্রকৃতি এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ (Ecosystem)। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ অন্যান্য প্রাণীর শত্রু তো নয়ই বরং সহোদর এবং পরিপূরক। বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ভাবনা এতই দৃঢ় যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) সৃষ্টিও এই উদ্দেশ্য নিয়ে। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণকারী প্রয়াসই এর লক্ষ্য।

৩। **আদর্শ ধর্মের কোনো একক স্রষ্টা বা প্রবর্তক হওয়া সম্ভব নয় :** মানুষের যা শুভঙ্কর ও আদর্শ তা একদিনে নির্ধারিত হয়নি। কালের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হতে হতে নির্ধারিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে বা একক ব্যক্তি দ্বারাও হয়নি। হাজার হাজার বছর ধরে কয়েক হাজার বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও মুনি-ঋষিদের প্রজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত হয়েছে।

আদর্শ গুণাবলীর সূত্রে প্রচলিত হিন্দুধর্ম

সময়কাল— আদি অনন্ত।

প্রতিষ্ঠাতা বা প্রবর্তক বা স্রষ্টা— একক কেউ নন।

পবিত্র গ্রন্থ— রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, গুরুগ্রন্থসাহিব, ত্রিপিটক, জৈনাগম ইত্যাদি।

● আদর্শ গুণাবলীর নিক্তিতে বিশ্লেষণ করলে হিন্দুধর্ম এক আদর্শ ধর্ম হিসেবে উত্তীর্ণ হয়। প্রচলিত ধারণা যে, প্রাচীন বিস্তীর্ণ ভারতের সিন্ধুনদের উপত্যকা জুড়ে এক সমৃদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। সেই সুসভ্য মানুষের মধ্যে যে ধর্মবোধ জাগ্রত ছিল সেটাই সনাতন ধর্ম। কালক্রমে তা হিন্দুধর্ম হিসেবে অভিহিত হয়েছে। সনাতন ধর্মের পরম্পরায় আমাদের পূর্বপুরুষ মুনি-ঋষিরা বলতে পেরেছিলেন 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। আমাদের ঋষিরা বলেছিলেন, 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। বিবেকানন্দই প্রথম দৃঢ় স্বরে বললেন— সনাতন ধর্ম ও হিন্দুধর্ম সমার্থক। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগো

নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক থেকে মূর্তিপূজক—এই দীর্ঘপথ পরিক্রমায় সমগ্র মানব সমাজ, প্রকৃতি ও প্রাণীকুলের কল্যাণকারী ভূমিকা না থাকলে সর্বোত্তম হিন্দুধর্মের ধারক ও বাহক হওয়া সম্ভব নয়।

শহরে ধর্মসম্মেলনের প্রারম্ভিক ভাষণে তিনি বললেন—'I thank you in the name of most ancient monks in the world; I thank you in the name of mother of religions and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classess and sects'। মানুষের আবির্ভাব লগ্ন থেকেই মনুষ্যত্বের উত্তরণের সেই ধর্মবোধ বা আদর্শবোধ— বিশ্বাস, যুক্তি, বুদ্ধি, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে নিষিক্ত হয়ে নিরন্তর প্রকৃতি ও প্রাণীকুলের কল্যাণ কামনা করে এসেছে। কালের নিয়মে মানুষ কখনও কখনও অদর্শচ্যুত হয়েছে, কু-প্রথা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে, দিশা থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে। হিন্দু মতে যুগসন্ধিক্ষণে বিভিন্ন অবতারের আবির্ভাব মানুষকে আদর্শচ্যুতি ও বিপর্যয় থকে রক্ষা করেছে ।

● ধর্মকে ঢাল করেই এবং ধর্মীয় বিধানের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করার অপপ্রয়াস চলে মাঝে মধ্যেই। উপাসনা পদ্ধতি ও ধর্মাচারণের সঙ্গে ধর্মের ফারাক তথাকথিত শিক্ষিত মানুষরাই বোঝেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বললেন— 'যত মত তত পথ'। অর্থাৎ অবাধ ধর্মীয় স্বাধীনতা এখানে। সেই সুযোগটাই সুচতুরভাবে কাজে লাগায় ধর্মব্যবসায়ীরা। সেই পথেই আসে তমসা, আসে ধর্মের গ্লানি। কিন্তু স্থায়ী হয় না। অন্ধকার কাটে যুগপুরুষের আবির্ভাবে। এখানেই হিন্দু ধর্মের মাধুর্য ও

মাহাত্ম্য। সতত পরিবর্তনশীলতার সম্ভাবনা ও সুযোগই প্রবহমান হিন্দুধর্মে স্বচ্ছ আদর্শের ধারা প্রবাহিত রেখে একে আদর্শ ধর্মে রূপান্তরিত করেছে।

● আধুনিক কালেও যুগাবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে, বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের পক্ষে, বাবাসাহেব আম্বেদকর ও ডাঃ হেডগেওয়ার জাত পাতের বিরুদ্ধে। ডাঃ হেডগেওয়ারের ভাবনায় 'হিন্দবঃ সোদরা সর্বে'--- সব হিন্দু সহোদর ভাই। 'ন হিন্দুর্পতিতো ভবেৎ'— কোনো হিন্দু পতিত হয় না।

আদর্শ গুণাবলীর সূত্রে প্রচলিত ইসলাম

সময়কাল— প্রায় ১৪০০ বছর।

প্রতিষ্ঠাতা বা প্রবর্তক— হজরত মহম্মদ।

পবিত্র গ্রন্থ— কোরান যা আল্লার বাণী হিসেবে পরিচিত।

● ইসলামে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরে বিশ্বাস না রাখলেও সমতুল অতি প্রাকৃতিক শক্তি আল্লার অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

● ইসলামপন্থীরা 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। বরং ইসলামে বিশ্বাসী ব্যক্তি ব্যতীত সবাইকে 'কাফের' বা শয়তান ভাবে এবং তাকে খুন, জখম ও লুঠে ভয়ংকর নির্দয়। লুঠের সম্পত্তি ভাগাভাগিতে ইসলাম বৈধতা দেয়। সম্পত্তির মধ্যে পার্থিব বস্তু ছাড়াও নারীও (গনিমতের মাল) গণ্য হয়। এই সব তথ্য কি আদর্শ ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে খাপ খায়? বাস্তবের অজস্র উদাহরণ ইঙ্গিত দেয় যে ইসলামপন্থীরা অন্য কোনো ধর্মমতের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে না এবং পৃথিবীর কোনো প্রান্তে করেও না। এমনকী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী না থাকলে নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ করে। পৃথিবীব্যাপী সন্ত্রাসী ও অপরাধীর উৎসস্থল লক্ষ্য করলে এর সত্যতা মান্যতা পায়। ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ তথা জেহাদের মাধ্যমে। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ায় ক্ষমতালোভী মহম্মদ হাজার হাজার ইহুদি হত্যার রক্তে রঞ্জিত করেছেন নিজের হাত। তিনি আবার ধর্মের প্রবক্তা! এর চেয়ে নির্মম পরিহাস আর কী হতে পারে! ইসলামপন্থী ভিন্ন অন্য একাধিক ধর্মীয় সম্প্রদায় কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানে অভ্যস্ত।

● আদর্শ ধর্মের কোনো একক প্রবর্তক হওয়া সম্ভব নয়; একইসঙ্গে ধর্মকে মানবকল্যাণকারী হতেই হবে। সেই কল্যাণকারী ভাবনা বা ধারণা এমন নির্দিষ্ট নয় যে আজ যা শুভঙ্কর আগামী ৫০০ বছর পরেও তা একই থাকবে। কালের নিয়মে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলি নির্ধারিত হয়। প্রথম স্ত্রী খাদিজার মৃত্যুর পর মহম্মদ পর্যায়ক্রমে আরও বারোটি নিকাহ করে একটি হারেম বানিয়েছিলেন। ৫২ বছর বয়সি মহম্মদের সঙ্গে ৬ বছর বয়সি শিশু আয়েশার বিবাহ তার একটি। এই সব ঘটনা তখনকার সময়ে স্বাভাবিক হিসেবে মান্যতা পেলেও আজকের নিরিখে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় এবং যুগপুরুষরা সেই অসাধ্য সাধনের কাজটি করেন। কিন্তু ইসলাম সেই ১৪০০ বছর পূর্বের মহম্মদের সময়ে পড়ে আছে আদিমতা নিয়ে। শ্যাওলা ও পাঁকে আবদ্ধ এক বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়েছে আজকের প্রচলিত ইসলাম। যারা শ্যাওলা ও পাঁক পরিষ্কার করে স্বচ্ছ জলধারা আনতে চাইছে তারা তলোয়ারের আঘাতে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে অথবা বিতাড়িত হয়ে লুকিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। বাংলাদেশের কার্টুনিস্ট সানিউর রহমান ও ডাঃ তসলিমা নাসরিন, পাকিস্তানের সুফি গায়ক আমজাদ সাবরি, তাহির শাহ ও তারেক ফতে, ব্রিটেনের লেখক সলমান রুশদি প্রমুখ অজস্র নাম এর প্রমাণ। প্রথম শ্রেণীভুক্ত এই সংস্কারপন্থী মুসলমানরা আক্রান্ত হচ্ছেন তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত জেহাদি ইসলামপন্থীদের দ্বারা। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত অসংখ্য মুসলমান নারী নীরব, অসহায় ও গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত।

আমার হাত নাড়াবার অধিকার আছে কিন্তু যখনই আমার হাতের সঙ্গে কারও নাকের সংঘর্ষ ঘটে তখনই হাত নাড়াবার অধিকার সংকুচিত হয়। যেখানে অপর ব্যক্তির অধিকার খর্ব হয় সেখানেই আমার অধিকারের সমাপ্তি'। 'ধর্মরাজ্য উপাসনার স্বাধীনতা (ধর্মীয় স্বাধীনতা) স্বীকার করে, অন্য কারও অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে'।

● আদর্শ ধর্ম তথা সনাতন ধর্মে--- 'অরুন্ধতনসূয়া চ সাবিত্রী জানকী সতী। দ্রৌপদী কন্নগী গার্গী মীরা দুর্গাবতী তথা।। লক্ষ্মীরহল্যা চন্নমা রুদ্রমাম্বা সুবিক্রমা। নিবেদিতা সারদা চ প্রণম্যা মাতৃদেবতাঃ'।। অন্যদিকে প্রচলিত ইসলাম মতে— তিন তালাক প্রথায় (বিবাহ বিচ্ছেদ) পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্য। নারী যেখানে লুঠের সম্পত্তির অংশ হয় এবং পণ্য হিসেবে ভাগবাঁটোয়ারা হয় সেখানে নৈতিকতা তথা আদর্শের প্রত্যাশা মূর্খামি ছাড়া কিছুই নয়। উপরিউক্ত বিশ্লেষণে ইসলামকে ধর্ম না বলে বরং জঙ্গি রাজনৈতিক মতবাদ ও জঙ্গি সম্প্রদায় হিসেবে বর্ণিত হতে পারে।

আদর্শ গুণাবলীর সূত্রে প্রচলিত খ্রিস্ট ধর্মমত

সময়কাল— প্রায় ২০০০ বছর।

প্রতিষ্ঠাতা বা প্রবর্তক— যীশুখ্রিস্ট।

পবিত্র গ্রন্থ— বাইবেল।

● যে সূত্রে ইসলাম ধর্ম হিসেবে গ্রাহ্য হতে পারে না, সেই একই যুক্তিতে যিশুর মতবাদও আদর্শ ধর্ম হিসেবে গণ্য হতে পারে না। তবে সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রশ্নে ইসলাম অপেক্ষা প্রচলিত খ্রিস্টমতবাদ কয়েকধাপ এগিয়ে। সমাজের অর্ধেক অংশ নারী এখানে 'গনিমতের মাল' বা পণ্য বা সম্পত্তি হিসেবে নির্ধারিত হয় না। সেই নিরিখে খ্রিস্টমতাবলম্বীরা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে বর্ণিত হতে পারে। আরও যুক্তিপূর্ণভাবে বলা যায়— যিশুর অনুসারী ধর্মীয় সম্প্রদায়। অনুরূপভাবে পারসিদের বলা যেতে পারে জরথুষ্ট্র অনুসারী ধর্মীয় সম্প্রদায়, ইহুদিদের মোজেস অনুসারী ধর্মীয় সম্প্রদায় ইত্যাদি।

ভারতরাষ্ট্রের প্রেক্ষাপট

ভারতের যুগপুরুষ সৃষ্ট ও ভারতে উদ্ভূত অন্যতম মতবাদগুলি হলো বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি। এগুলি সবই হিন্দুধর্মেরই অংশ এবং প্রকৃত অর্থে ধর্ম না বলে ধর্মীয় মতবাদ বলা

বেশি যুক্তিযুক্ত। এইসব ধর্মীয় মতবাদে পুষ্ট সম্প্রদায়কে আরও যুক্তিপূর্ণভাবে বলা উচিত বুদ্ধের অনুসারী ধর্মীয় সম্প্রদায় (হিন্দু), মহাবীর অনুসারী ধর্মীয় সম্প্রদায় (হিন্দু), নানক অনুসারী ধর্মীয় সম্প্রদায় (হিন্দু) ইত্যাদি। আবার লোকনাথ অনুসারী ধর্মীয় সম্প্রদায় (হিন্দু), অনুকূল চন্দ্র অনুসারী ধর্মীয় সম্প্রদায় (হিন্দু), বালক ব্রহ্মচারী অনুসারী ধর্মীয় সম্প্রদায় (হিন্দু), সাইবাবা অনুসারী ধর্মীয় সম্প্রদায় (হিন্দু) ইত্যাদি সাম্প্রতিক অতীতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এসবই 'যত মত তত পথ'-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত। এরা সবাই হিন্দু ধর্মের এক একটি সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বহন করে। বৃহত্তর সনাতন ধর্ম বিশালতা ও ব্যাপ্তিতে হিমালয়ের মতো। ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি হিমালয়ের অংশীভূত ছোটো ছোটো পর্বতশৃঙ্গ। এইসব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আংশিক হিন্দুত্বের লক্ষণ থাকলেও বৃহত্তর হিন্দুত্বের বিশালতা গভীরতা, উদারতা, সহনশীলতা, ব্যাপ্তি ও মহিমা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি মতবাদ ও সনাতন হিন্দুধর্ম এক পংক্তিভুক্ত নয় এবং হিন্দুধর্মের সঙ্গে এই মতবাদগুলিকে গুলিয়ে ফেলে তুলনামূলক আলোচনাও ঠিক নয়। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদিকে ধর্ম বলেও অভিহিত করা ঠিক নয়। এগুলি এক-কটি পন্থ। হিন্দুধর্ম বা সনাতন ধর্ম এক আদর্শ মানবতাবাদ তথা আদর্শ ধর্ম এবং সেই সূত্রেই হিন্দুরা ব্যবহারে ও মানসিকতায় সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। ইসলামপন্থীরা বা মহম্মদ অনুসারীরা একটি ধর্মচ্যুত জঙ্গি সম্প্রদায় এবং বাকিরা এক একটি নিছক মতবাদ মাত্র।

হত্যা,অপরাধ, তিনতালাক সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অমানবিক, মসজিদে মাইক বাজানো হাইকোর্টের রায়ে অবৈধ এবং ধর্ম সম্পর্ক রহিত। এতদ্‌সত্ত্বেও ইসলামপন্থীরা ধর্মের নামে জেহাদ করে এগুলিকে কায়েম রাখতে চায়। সেইজন্যই ইসলামপন্থীরা জঙ্গি সম্প্রদায় হিসেবে অভিহিত হয়েছে। ইসলামপন্থীদের কাছে এর থেকে বেশি প্রত্যাশা অনভিপ্রেত।

আমাদের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত?

আমাদের উদ্দেশ্য 'ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা'। হিন্দুধর্মের পবিত্র ভূমিতেই এটা সম্ভব। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মতে—'ধর্মরাজ্যের অর্থ Theocratic State বা সম্প্রদায়বাদী রাষ্ট্র নয়'। 'আবার রাষ্ট্রের সঙ্গে উপাসনা পদ্ধতির কোনো সম্পর্ক নাই'। 'ধর্মরাজ্য শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সমৃদ্ধির জন্য সকল উপাসনা পদ্ধতিকে মান্যতা দেয়। এজন্য সহনশীলতা প্রয়োজন কিন্তু প্রত্যেকের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ'। 'আমার হাত নাড়াবার অধিকার আছে কিন্তু যখনই আমার হাতের সঙ্গে কারও নাকের সংঘর্ষ ঘটে তখনই হাত নাড়াবার অধিকার সংকুচিত হয়। যেখানে অপর ব্যক্তির অধিকার খর্ব হয় সেখানেই আমার অধিকারের সমাপ্তি'। 'ধর্মরাজ্য উপাসনার স্বাধীনতা (ধর্মীয় স্বাধীনতা) স্বীকার করে, অন্য কারও অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে'।

তিনি আরও বলেছেন— 'ধর্ম মন্দির বা মসজিদে আবদ্ধ থাকে না। ভগবানের উপাসনা ধর্মের একটি অঙ্গ মাত্র। ধর্ম আরও ব্যাপক। কোনো ব্যক্তি নিয়মিত মন্দির বা মসজিদে যাতায়াত করলেও ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ হতে পারে'। উপরের বক্তব্যে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল সুর নিহিত আছে।

নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক থেকে মূর্তিপূজক—এই দীর্ঘপথ পরিক্রমায় সমগ্র মানব সমাজ, প্রকৃতি ও প্রাণীকুলের কল্যাণকারী ভূমিকা না থাকলে সর্বোত্তম হিন্দুধর্মের ধারক ও বাহক হওয়া সম্ভব নয়। ধর্মকে সার্বিক কল্যাণকারী হতেই হবে।□

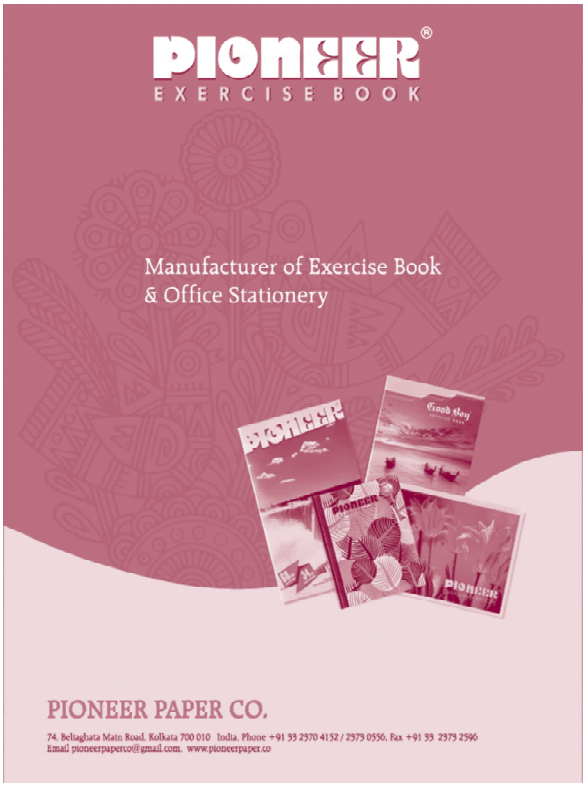

ধর্ম মানুষের মজ্জাগত , 'ইজম্' সচেতন মনের আমদানি

ধর্ম মানুষের মজ্জাগত , আর 'ইজম' (ism) সচেতনভাবে মানুষ শেখে এবং সেটাকে অন্তরের যুক্তিবোধের মধ্যে মান্যতা দেয়। ধর্ম প্রতিদিন বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যের অনুবর্তনে মানুষের ভেতরে প্রবেশ করে। জীবনচর্যা থেকে ধর্মাচারকে আলাদা করা যায় না। 'ইজম' সচেতনতার সামগ্রী কিন্তু ধর্মাচরণ মানুষের জীবনচর্যার পরতে পরতে অবচেতন ভাবেই প্রবাহিত হয়।

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

১৯৬২ সাল, ভারত-চীন যুদ্ধ (২০ অক্টোবর— ২১ নভেম্বর)- এর কাছাকাছি সময়। ত্রিভুবন নারায়ণ সিংহের সঙ্গে জওহরলাল নেহরুর একটি কথোপকথনের কথা বলেছেন দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজী। টিএন সিংহ উত্তর প্রদেশের মানুষ, পরে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী (১৮ অক্টোবর, ১৯৭০— ৪ এপ্রিল, ১৯৭১) এবং তারও পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল (৬ নভেম্বর, ১৯৭৯— ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১)। সেসময় পার্লামেন্টের অধিবেশনের আগে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বাইরে এসে বসতেন, নানান সদস্যের সঙ্গে আলাপচারিতা চলত। সেদিনও বসেছেন। টিএন সিংহের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। নানা কথায় তিনি বললেন, আমাদের ধর্মাচারগুলি যারা তৈরি করেছেন, তারা তো এই পৃথিবীর মানুষ নন, তাহলে দেশের মানুষের বাস্তব সমস্যা— ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দারিদ্র্য কী করে ধর্মাচার দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? টিএন সিংহ বললেন, তা তো নয়! শ্রীচণ্ডীতে তো এটা লেখা আছে— 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।।... যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।... ইত্যাদি।' এসব অবান্তর হয় কী করে! ক্ষুধা, নিদ্রা, ভ্রান্তি এসবই তো বাস্তবের প্রতিভূ, জীবনচর্যা থেকে আগত বিষয়! তখন নেহরুজী টিএন সিংহের কাছ থেকে সমস্ত বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে শুনলেন। এরপর থেকেই তাঁর জীবনে ধর্ম নিয়ে নতুন চিন্তা-চেতনার উদয় হলো। ১৯৬৪ সালে নেহরুর মৃত্যুর ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে শ্রীমন্ত নারায়ণের একটি বইয়ের প্রস্তাবনায় তিনি লেখেন, 'মানুষকে মন আচ্ছা হো ধরম্ কে আধার পর।' এটাই তাঁর লিপিবদ্ধ শেষ দার্শনিক উপলব্ধি। তার আগে ধর্ম নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না তাঁর। হিন্দুধর্ম অবিশ্বাসী মানুষকেও প্রভাবিত করতে পারে, যদি তার সঠিক ব্যাখ্যা করা যায়।

২. ঠেংড়ীজী কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে চেয়েছেন, মানুষ বলেন, সে ধর্ম মানেন না; কিন্তু তার জীবনাচরণ ধর্মাচারকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। একটি ঘটনার কথা বলছেন। সিপিআই-য়ের মহারাষ্ট্র শাখার সম্পাদক ছিলেন ক্রান্তিসিনহা নানা পাটিল (৩ আগস্ট, ১৯০০— ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৬। দলের প্রতিনিধি হিসেবে মারাঠাওয়ারা অঞ্চলের বীড কেন্দ্র থেকে সাংসদ হয়েছিলেন ১৯৬৭ সালে। তার আগে ১৯৫৭ সালে সাঁতারা কেন্দ্র থেকে সাংসদ হন)। তিনি কোনো একবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন উচ্চাধিকারীর সঙ্গে একই ট্রেনের কোচে সহযাত্রী হয়ে যাচ্ছিলেন। স্বয়ংসেবকদের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, যখন ট্রেনে কোনো উচ্চাধিকারী যান, তখন খাবার সময় সকল স্বয়ংসেবক তাঁর কাছে আসেন ও একসঙ্গে খাওয়া হয়। তাই দুপুরে খাবার সময় সকলেই সেই আধিকারিকের কাছে এলেন। তিনি পাটিলজীকেও ডাকলেন, আসুন, আমাদের সঙ্গে ভোজন করবেন। তখন পাটিলজী একটু দূরে সরে গিয়ে বললেন, না না, আজকে আমার নির্জলা একাদশীর উপবাস। স্বয়ংসেবকেরা যা খাচ্ছেন, তা হলো, রুটি ও পেঁয়াজের আচার। তাহলে ভাবুন, সিপিআই-য়ের মানুষটি নিরম্বু উপবাস করছেন, কিন্তু হিন্দুত্ববাদী মানুষটি একাদশীর দিন রুটির সঙ্গে পেঁয়াজ খাচ্ছেন!

৩. দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজী একবার রসিকতা করে বলছেন, 'হিন্দুত্বকা পরিভাষা সমঝনা বহোত হি কঠিন হ্যায়।' এরপর একটি ঘটনার কথা বললেন, ১৯৬৮ সালে সংসদীয় দলের সদস্যরূপে তিনি সরকারি যাত্রায় রাশিয়া গিয়েছিলেন। দলের প্রমুখ ছিলেন নীলম

সঞ্জীব রেড্ডি। ওই দলে সিপিআই-য়ের হীরেন মুখার্জিও ছিলেন। মস্কোর ইন্সটিটিউট অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে হীরেনবাবুর বক্তব্য ছিল। সেখানে অনেক রাশিয়ান বিদ্বান মানুষ উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্যের বিষয় : Religion and God। মার্কসীয় আধারে পুরো ভাষণ। হীরেনবাবু সিদ্ধান্তে এলেন, God is Fraud. ঈশ্বর ধোকা হ্যায়, জালসাজি হ্যায়। অন্য কারো মন্তব্য বা বিতর্কের অবতারণার সুযোগ সেখানে ছিল না। রাশিয়ার বিদ্বানরা প্রচুর হাততালি দিলেন। সভা শেষ হলো। হোটেলে দুপুরে হীরেনবাবুর একটা বই ফেরত দিতে তাঁর ঘরে গেছেন ঠেংড়ীজী। দরজা বন্ধ, তবে সামান্য ফাঁক ছিল। হোটেলে বলে দেওয়া হয়েছিল, কারো ঘরে গেলে বেল বাজিয়ে অনুমতি নিয়ে তবে ঢুকতে হবে, কারণ রুমের আবাসিকরা নিজেদের স্বাভাবিক পোশাকে থাকতে পারেন, তাই এই অলিখিত নিয়ম। ঠেংড়ীজী বেল বাজিয়েই যাচ্ছেন, ফেরার তাড়াও ছিল। কিন্তু হীনেরবাবুর দুটি কানে যথেষ্ট বধিরতা, কর্ণযুগলে শ্রবণযন্ত্র ব্যতিরেকে প্রায় কিছুই শুনতে পেতেন না। ঠেংড়ীজীর মনে পড়লো সে কথা। তিনি এবার দরজায় উঁকি মারলেন। দরজায় পিঠ দিয়ে সোফায় পদ্মাসনে বসে আছেন হীরেনবাবু। কানের যন্ত্রদুটি পাশে খুলে রাখা। ধ্যানমুদ্রায় উচ্চারণ করে চলেছেন 'চিদানন্দরূপঃ শিবোহহম্ শিবোহহম্'। স্বাভাবিক পোশাকে নেই জেনে ঠেংড়ীজী এবার দরজা ঠেলে ঢুকলেন। হীরেনবাবু তখনও চোখ বন্ধ করে নিবিষ্ট মনে স্তোত্রগীত করে চলেছেন। স্তোত্র শেষ হলো, হীরেনবাবু ঠেংড়ীজীকে দেখে চমকে উঠলেন। শ্রবণযন্ত্র পরে নিয়ে বললেন, 'How long you are standing here?' দত্তোপন্তজী বললেন, 'Two or three minutes.' হীরেনবাবু বলে উঠলেন, 'Mind you, I don't believe in God।' মনে রেখো, আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। ঠেংড়ীজী বললেন, 'ঠিক আছে'।

৪. আরও একটি ঘটনা দিয়ে তিনি হিন্দুত্ব ও ধর্মাচরণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। ১৯৭০ সাল। রামকৃষ্ণ রেড্ডির সঙ্গে কন্যাকুমারীতে তাঁর একটি মিটিং ঠিক হলো মহালয়ার দিন সকাল ন'টায়। কন্যাকুমারীর মানুষ বিশ্বাস করেন, মহালয়ার দিন খুব সকালে স্নান করে দেবীর পুজা করলে পুণ্য হয়। ন'টায় মিটিং বলে যথেষ্ট সকালে উঠে স্নান করে মন্দিরে ঢোকার আগে তিনি ঠেংড়ীজীকে বললেন, আমি শুধু এখানকার নেতাই নই, সমগ্র তামিলনাড়ুর একজন পরিচিত নেতা। ফলে এই মন্দিরের চারপাশে সবাই আমাকে চেনেন।

ঠেংড়ীজী বললেন, সে তো খুব ভালো কথা।

ভদ্রলোক বললেন, আরে সেটাই তো আমার সমস্যা!

—কেন?

—১৫ দিন আগে আমার পার্টি ঘোষণা করেছে God does not exist। ভগবানের অস্তিত্ব নেই। এবারও আমাকে রাজ্যসভার টিকিট নিতে হবে। আগামী ২ এপ্রিল রাজ্যসভার সমাপ্তি, মাত্র কয়েকমাস বাকি। এখন যদি আমি মন্দিরে ঢুকি আর এই ঘটনা যদি চারপাশে রটে যায়, তাহলে টিকিট পাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ কয়েকজন হেভিওয়েট প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন এই টিকিট পাবার লোভে।

—তাহলে আপনি যাবেন না!

—(অত্যন্ত ভেঙে পড়ে তিনি বললেন) কিন্তু মহালয়ার পুণ্য অর্জন তো আমায় করতেই হবে। আমি একটি উপায় বের করেছি। মন্দিরের পাশে একটি ছেলের কাছ থেকে কাগজ আর পেনসিল নিয়ে তামিল ভাষায় নিজের নাম, গোত্র, ঠিকানা লিখে চিরকুটটি ঠেংড়ীজীর হাতে দিয়ে বললেন, আমার নামে একটি স্পেশাল পূজা আপনাকে দিতে হবে। ঠেংড়ীজী বললেন, ঠিক আছে। মন্দিরের উদ্দেশে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। দু'পা এগোতেই তিনি আবার ডাকলেন। তারপর ব্যাগ খুলে অনেকগুলি টাকার নোট দিয়ে বললেন, এটা তার হয়ে স্পেশাল দক্ষিণা পুরোহিতকে পৌঁছে দিতে হবে। ঠেংড়ীজী তা নিলেন এবং এগিয়ে চললেন। আবারও ডাকলেন তিনি। এবার বিরক্তই হলেন ঠেংড়ীজী, কারণ ন'টার সময় নির্ধারিত বৈঠক, হাতে সময় বিশেষ নেই, তাই তাড়াহুড়ো ছিল। কিছুটা বিরক্তির সুরে বললেন, কী ব্যাপার? এবার এম.পি. ভদ্রলোক তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। ঠেংড়ীজী অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, এ কী করছেন! ভদ্রলোক উত্তরে বললেন, 'Kindly transfer this also'।

এই ঘটনাটি বলে ঠেংড়ীজী মুচকি হেসে বললেন, এত বড়ো বড়ো লোকেরা ধর্মাচরণ নিয়ে এত বড়ো বড়ো কথা ভেবেছেন যে, আপনাদের আর বেশি ভাবার দরকার নেই।

ধর্ম মানুষের মজ্জাগত , আর 'ইজম' (ism) সচেতনভাবে মানুষ শেখে এবং সেটাকে অন্তরের যুক্তিবোধের মধ্যে মান্যতা দেয়। ধর্ম প্রতিদিন বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যের অনুবর্তনে মানুষের ভেতরে প্রবেশ করে। জীবনচর্যা থেকে ধর্মাচারকে আলাদা করা যায় না। 'ইজম' সচেতনতার সামগ্রী কিন্তু ধর্মাচরণ মানুষের জীবনচর্যার পরতে পরতে অবচেতন ভাবেই প্রবাহিত হয়। এইভাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজী বুঝিয়ে দিলেন, সামাজিক লাভের জন্য কোনো ইজমে যেতে হয়। কিন্তু অন্তর অন্য কথা বলে, তাই অন্য পুণ্যার্থীকে প্রণাম করে তাকে বলতে হয়, এটাও দেবতার চরণে পৌঁছে দেবেন! একদম খাঁটি সত্যকে তুলে ধরেছেন রাষ্ট্রঋষি।

(লেখক দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর বক্তব্য থেকে মণিমাণিক্য উদ্ধার করে এনেছেন)

ইউরেটরে স্টোন ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

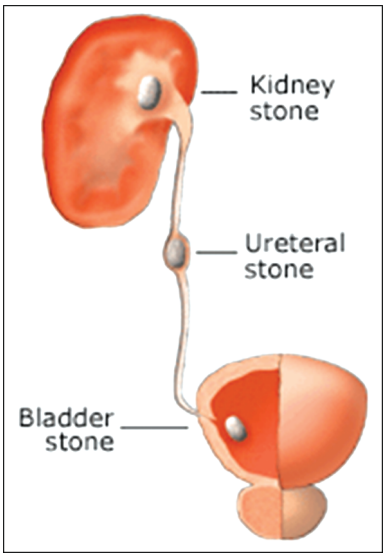

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

ইউরেটরে স্টোন সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে আমরা জেনে নেব, ইউরেটর বলতে কী বোঝায়। কিডনি থেকে ইউরিনারি ব্লাডার বা মূত্রথলি পর্যন্ত ইউরিন নেমে আসার যে সরু রাস্তা বা চ্যানেল সেটাকেই ইউরেটর বলা হয়। কিছু পরিমাণ প্রোটিন ও গ্লাইকোপ্রোটিন ক্যালসিয়াম জাতীয় খনিজ পদার্থের মিশ্রণে স্বচ্ছ দানা যা পাথরের আকৃতি নেয়। যেহেতু মূত্র বেরিয়ে আসার রাস্তাটা খুব সরু, তাই কিডনি থেকে ছোটো ছোটো স্টোন বেরিয়ে যখন ইউরেটরে আসে তখন স্বাভাবিকভাবেই স্টোনগুলোকে বের করে দেবার জন্য শরীর চেষ্টা করে, কারণ স্টোন থাকার কারণে ইউরিনের যে ফ্লো বা গতি তা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ইউরেটর স্টোন বিভিন্ন ধরনের হয়। বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল কম্পোজিশন (রাসায়নিক উপাদান) স্টোনগুলোর মধ্যে থাকে। যেমন ক্যালসিয়াম ফসফেট স্টোন, জ্যানথিন স্টোন, ইউরিক অ্যাসিড স্টোন। এইরকম বিভিন্ন ধরনের স্টোন কিডনিতে হয় এবং সেগুলো ইউরেটরে নেমে আসে।

মূত্র প্রথমে কিডনির মাধ্যমে ব্লাডারে এসে জমা হয় ও মূত্রনালি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। ছোটো পাথর সাধারণত প্রস্রাবের সঙ্গেই বেরিয়ে যায়। এর জন্য কোনও যন্ত্রণা অনুভূত হয় না বলে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু স্টোন যখন একটু বড়ো হয় তার কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়।

স্টোন বড়ো হলে ইউরেটরে খুব ব্যথা অনুভব করেন রোগী। পেটের ডানদিক-বাঁদিক এবং পেছনদিকে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে। প্রস্রাবে জ্বালা, তলপেটে ব্যথা-যন্ত্রণা হয়, মূত্র বা প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায় কিংবা ফোঁটা ফোঁটা নির্গমন, এমনকী মূত্রের সঙ্গে রক্ত দেখা দেয়, বমি হয়। ব্যথা কিডনি অঞ্চলের দিকে অথবা নীচের দিকে জেনিটাল এরিয়া পর্যন্ত নেমে আসতে পারে।

স্টোনের উপরিভাগ যদি মসৃণ হয় তাহলে পাথর অনেক সময় ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসে। কিডনি থেকে ইউরেটরের মধ্য দিয়ে মূত্রনালির মধ্যে যখন নেমে আসে তখন ব্যথাটা অনেক কমে যায়। কিন্তু যতক্ষণ ইউরেটরের মধ্যে থাকে ইউরেটর মাসলগুলো সংকুচিত হয় পাথরটাকে ঠেলে নীচে নামিয়ে দেওয়ার জন্য, তখন খুব ব্যথা হয়। এটাকে কলিক পেইন বলে। এই ইউরেটারি কলিক যৌনাঙ্গ পর্যন্ত আসতে পারে। ছেলেদের ক্ষেত্রে অণ্ডকোষের দিকে ব্যথাটা নামতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে স্টোনের উপরিভাগ মসৃণ হলে ব্যথা কম হয়। কিন্তু স্টোনের উপরিভাগ মসৃণ না হলে যেমন অক্সালেট স্টোন কাঁটা কাঁটা খাঁজের মতো তখন আটকে যাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং ইউরেটর যখন খুব জোরে সংকুচিত হয় তখন রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে।

রোগী উপসর্গের মধ্যে কখনও জ্বর, কলিক পেইন এবং প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তক্ষরণ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে আসেন।

প্রস্রাবে ব্যথা অনুভূত হওয়া, জ্বর, বমি এবং প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তক্ষরণ হলে দেরি না করে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। বিশেষ করে যাঁদের বাড়িতে ইউরেটরে স্টোন বা কিডনিতে পাথর হয়েছে এমন কেউ থাকেন অর্থাৎ স্টোন সংক্রান্ত কোনও ইতিহাস থাকলে যেমন বাবা-মা-ভাই-বোন কারো যদি স্টোন পূর্বে হয়ে থাকে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বাড়ির কারো ইউরেটরে বা কিডনির স্টোনের সমস্য দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় তার মধ্যে কিডনি, ইউরিন পরীক্ষার মতো রুটিন চেক-আপ, ইউরিন কালচার করা হয়। দেখা হয় কোনো ইনফেকশন আছে কি না। এইসব উপসর্গের সঙ্গে জ্বর থাকলে রুটিন চেক-আপের সঙ্গে সঙ্গে এক্সরে করা হয়। আলট্রাসোনোগ্রাফি করা হয়।

আলট্রাসোনোগ্রাফিতে ইউরেটরের মধ্যে যদি পাথর দেখা যায় তাহলে ইউরিন স্বাভাবিকভাবে নীচে নেমে আসতে পারে না, তার ফলে কিডনির ওপর চাপ পড়ে, ইউরিন ফর্মেশনের পরে যে রাস্তাটা দিয়ে নেমে আসে, পাথরের সেই অংশটা স্ফীত হয়ে যায়। এর ফলে বোঝা যায় যে জায়গাটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এছাড়া আলট্রাসাউন্ড বা এক্সরে করার পর যদি দেখা যায় যে পাথর আছে ইউরেটরের মধ্যে, তাহলে রোগীকে ইন্ট্রাভেনাস ইউরোগ্রাফি (আই ভি ইউ, যাকে আগে আই বি পি বলা হতো) করা হয়। এখানে একটা কেমিক্যাল পদার্থ ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে আয়োডিন আছে। যখন আয়োডিন স্পিরিটেড হয়ে কিডনির মধ্যে গিয়ে ফিল্টার্ড হয়ে ইউরেটরের প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে নামে, তখন সাদা একটা ছবি পাওয়া যায়। এখানে যদি কোনও পাথর থাকে তাহলে সাদা জায়গাটার মধ্যে একটা নেগেটিভ শ্যাডো থাকে অর্থাৎ কালো একটা এরিয়া থাকতে পারে।

রেডিয়ো লুসান স্টোনের ক্ষেত্রে আই ভি ইউ বা আই বি পি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আবার কখনও কখনও কোনও কিছুতেই বোঝা যায় না স্টোন, রেডিয়ো লুসান। সব থেকে ভালো বোঝা যাবে সিটি স্ক্যান করে। তবে সিটি স্ক্যানে একটাই অসুবিধে যে এটা খুবই খরচসাপেক্ষ চিকিৎসা। সি টি স্ক্যান করার সময় সিটি ইউরোগ্রাফি করা যায়। এইসব পরীক্ষার সাহায্যে নিশ্চিত হওয়া যায় যে পাথর আছে। এ ব্যাপারে দেখতে হয় পাথরটা ঠিক কোন এরিয়াতে, কোন পজিশনে, কিডনি থেকে কতট নীচে, মূত্রনালির কতটা কাছে রয়েছে, তা থেকে চিকিৎসা ব্যবস্থা ঠিক করেন চিকিৎসকেরা।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা :

স্টোন চিহ্নিতকরণ বা তার অবস্থান জেনে লক্ষণ মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়। আমার ৩৭ বছরের চিকিৎসক জীবনে বহু সফলতা পেয়েছি। ▮

গীতা জয়ন্তী ও ভগবদ গীতার তাৎপর্য

সৌমিত্র সেন

গীতা জয়ন্তীর দিনটি শ্রীমদ্ভগবত গীতার প্রতীকী জন্মবার্ষিকী হিসেবে পালিত হয়। গীতা জয়ন্তী হিন্দুদের পবিত্র ভগবদগীতার জন্মদিন। কথিত আছে যে এই দিনটিতে কেবল ভগবদগীতা দেখার দারুণ উপকার রয়েছে। এই দিনে যদি গীতার শ্লোক পাঠ করা হয় তবে মানুষের পূর্ব জন্মের ত্রুটিগুলি নষ্ট হয়ে যায়। সনাতন ধর্মে এর বিশাল গুরুত্ব রয়েছে। কথিত আছে যে, যখন অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর কর্মপথ থেকে বিচলিত হতে শুরু করেছিলেন, এই দিনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রে গীতাজ্ঞান দিয়েছিলেন

এটা বিশ্বাস করা হয় যে 'ভগবত গীতা' কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে (বর্তমান ভারতের হরিয়ানাতে) শ্রীকৃষ্ণ নিজে অর্জুনের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুগত ও সহকারী সঞ্জয় তাঁর গুরু বেদব্যাসের আশীর্বাদে পেয়েছিলেন দূরবর্তী স্থান দেখার ক্ষমতা। এই গ্রন্থটি তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয়েছিল। সঞ্জয় দ্বারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বর্ণিত এটি যুদ্ধক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে কথোপকথন।

হিন্দু বর্ষপঞ্জী অনুসারে গীতাজয়ন্তী মার্গশীর্ষ শুক্ল একাদশী তিথিতে পালিত হয়। এটি গীতার প্রতীকী জন্মদিন হিসেবে বিবেচিত হয়। গীতা জয়ন্তীর সঙ্গে সম্পর্কিত এমন কিছু বিধিপালনের কথা বলা হয়, যা পালন করলে মানুষ কখনই কর্মের পথ থেকে বিচ্যুত হয় না, তার পাশাপাশি ধন-সম্পদ, সমৃদ্ধি, বুদ্ধিরও বৃদ্ধি হয়। সাহিত্য এবং আচার-অনুষ্ঠানের সংযোগ রয়েছে গীতাজয়ন্তী পালনের সঙ্গে। ফলস্বরূপ মানুষ সবসময় অহংকার, লোভ, কাম, ক্রোধ, কুৎসা থেকে বিরত থাকে।

গীতা জয়ন্তীর দিন শ্রীমদ্ভাগবদ গীতাটি স্পর্শ করুন, তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে অবলোকন করুন এবং তাঁর কাছে সৌভাগ্যের জন্য প্রার্থনা করুন। সম্ভব হলে গীতার কিছু পঙ্‌ক্তি পাঠ করুন এবং এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করুন।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।। (২/২৩)

অর্থাৎ শস্ত্র এই আত্মাকে কাটতে করতে পারে না, অগ্নি একে দগ্ধ করতে পারে না, জল একে সিক্ত করতে পারে, না বায়ু একে শুষ্ক করতে পারে না।

এরকম অনেকগুলি পঙ্‌ক্তি রয়েছে যেগুলি পাঠ এবং তার অর্থ বোঝার দ্বারা মানুষ কেবল জীবনের দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পায় না, জীবনে চলার পথও সুগম করতে পারে। ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে এই জ্ঞানই দিয়েছেন।

এই দিনে শঙ্খের পূজা করাও ফলপ্রদ বলে মনে করা হয়। পূজার পরে শঙ্খের ধ্বনিতে দুষ্ট শক্তিগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং লক্ষ্মীর আগমন ঘটে। ভগবান বিষ্ণু এই উপাসনায় খুব খুশি হন।

এই দিনে শ্রীকৃষ্ণের মহান রূপের উপাসনাও খুব ভালো বলে বিবেচিত হয়। বলা হয়ে থাকে যে সমস্ত বিনষ্ট হওয়া কর্মগুলি এর দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং মানুষের জীবনে শান্তি আসে।

পরিবারে যদি কলহ, বিপর্যয় বা অশান্তি সম্পর্কিত সমস্যা থাকে তবে গীতাজয়ন্তী থেকেই ভগবদ গীতা পাঠ শুরু করা উচিত। বিশ্বাস করা হয় যে এর ফলে মানুষের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বিকাশ হয়।

এই পবিত্র গ্রন্থটি গৃহে থাকা অত্যন্ত শুভ ও মঙ্গলজনক বলে বিবেচিত হয়। কথিত আছে যে এই গীতামাকে নিয়ে মা লক্ষ্মী একবছর ঘরে বসে থাকেন। এরফলে কঠিন পরিস্থিতিতেও মানুষ বিপথগামী হয় না।

কুরুক্ষেত্রে গীতাজয়ন্তী উৎসব ছাড়াও গীতা জয়ন্তীর উদযাপন দেশের বেশ কয়েকটি জায়গাতেও সংঘটিত হয়। তবে কুরুক্ষেত্রে প্রচণ্ড উৎসাহ সহকারে হয়। ব্রহ্ম সরোবর ও সন্নিহিত সরোবরের পবিত্র জলাশয়ে পবিত্র স্নানে অংশ নিতে ভারতজুড়ে ভক্তরা কুরুক্ষেত্রে সমবেত হন। দিবসটি উদযাপন করতে প্রতিবছর একটি মেলার আয়োজন করা হয় যা প্রায় সাত দিন ধরে চলে । এটি গীতা জয়ন্তী সমারোহ নামে পরিচিত। হাজার হাজার মানুষ গীতা পাঠ, নৃত্য পরিবেশনা, নাটক-অভিনয়, ভজন, আরতি ইত্যাদির জন্য উৎসবে সমবেত হন।

(গীতাজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ

বর্ণ চতুষ্টয় ও শিক্ষা

ইন্দুমতী কাটদরে

বৈশ্য বর্ণ :

আজ বৈশ্য বর্ণের আধিপত্য পুরো সমাজ তথা অর্থের উপর অধিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। সব বর্ণের লোক নিজ নিজ বর্ণ-ধর্মকে ত্যাগ করে বৈশ্য বৃত্তিকেই গ্রহণ করতে লেগেছেন। শিক্ষকের জ্ঞান, চিকিৎসকের চিকিৎসা, পুরোহিতের পৌরোহিত্য সবই বৈশ্যবৃত্তির অধীন হয়ে গিয়েছে।

বৈশ্য বাস্তবে সমাজের পোষণকারী হয়ে থাকে। কিন্তু সে এই দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। সে নিজের আয়ের কথা ভাবছে সমাজের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করছে না। অর্থার্জনের ক্ষেত্রে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে, বিতরণের ক্ষেত্রে আজ অনেক প্রকারের বিপরীত পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাস্তবে বৈশ্যবর্ণকে এই বিষয়ে চিন্তা করা উচিত কিন্তু তারা তা করে না।

সমাজের পোষণের জন্য অন্নকে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এজন্য কৃষি সবচাইতে মুখ্য শিল্প হওয়া দরকার। কিন্তু আজ সবাই কৃষিকাজে বিমুখ হচ্ছেন। কৃষকের সংখ্যা আস্তে আস্তে কমছে। যান্ত্রিকীকরণের কারণে কৃষি এখন কৃষকের জন্য কঠিনও হয়ে গিয়েছে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও যন্ত্র এই তিনটি মিলে কৃষিকে, কৃষির সঙ্গে কৃষককে এবং অন্নের আবশ্যকতা আছে এমন সমাজকে গভীর সংকটে ফেলে দিয়েছে। রাসায়নিক সার মাটিকে অনুর্বর করছে। অধিক মূল্যের সার ও যন্ত্রের কারণে কৃষক ধ্বংস হচ্ছে এবং মানুষকে দুষিত অন্ন, শাকসবজি ও ফল খেতে হচ্ছে। এজন্য তাদের স্বাস্থ্য সংকট তৈরি হচ্ছে। ট্রাক্টরের মতো যন্ত্রের দ্বারা কৃষি হবার কারণে গোবংশের নিধন হয়ে চলেছে। এতে সাংস্কৃতিক সংকট বেড়ে যায়, লোকে পাপের ভাগী হয়। আহার থেকে শরীর, মন, বুদ্ধি, চিত্ত সবকিছুই প্রভাবিত হয়ে থাকে। এর ওপর যে সংকট এসে পড়েছে তার অন্তিম দায়িত্ব বৈশ্য বর্ণের উপরেই পড়ছে।

সমাজে সমৃদ্ধির ভিত্তি বৈশ্যবর্ণের ওপর রয়েছে। যখন অর্থনীতি উৎপাদক শিল্পের ওপর নির্ভরশীল হয়, তখন সমাজ সমৃদ্ধ হয়। আজ আমাদের অর্থনীতি উৎপাদনহীন হয়ে পড়েছে। যাতায়াত, বিজ্ঞাপন, নিবেশ তথা মধ্যস্বত্বের জন্য বস্তুর মূল্য এবং মানুষের ব্যস্ততা বেড়ে যায় এবং অর্থের অনুৎপাদক লেনদেন হয়। এটা বলা যায় যে, এতে করে রোজগারের পথ সুগম হয়। কিন্তু এটা হচ্ছে রোজগারের আভাসমাত্র, প্রকৃত রোজগার নয়।

যন্ত্রদ্বারা উৎপাদন আর্থিক ক্ষেত্রের অনিষ্ট করে থাকে। এতে শিল্পের কেন্দ্রীকরণ ঘটে। বড়ো কারখানার কারণে উৎপাদনের ব্যাপকতা বাড়ে কিন্তু কেন্দ্রীকরণ হবার কারণে মানুষের স্বতন্ত্র রোজগার কেড়ে নেওয়া হয়। কারিগর মালিক না হয়ে চাকরে পরিণত হয়। আর্থিক স্বনির্ভরতা নষ্ট হবার জন্য জনমানসও স্বনির্ভর থাকে না।

কারিগরের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরিও নষ্ট হয়। যখন হাতে কোনো বস্তু উৎপাদিত হয় তখন বস্তুতে বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য, কারিগরের মধ্যে সৃজনশীলতা ও কল্পনাশীলতা এবং সবমিলিয়ে উৎপাদনে উৎকৃষ্টতা ও মালিকানা বেড়ে যায়। কাজেও আনন্দ হয়ে থাকে। এতে মানসিক সুখ মেলে। মানসিক সুখ দ্বারা সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়। এটা হলো উৎপাদনের সাংস্কৃতিক দিক। অর্থনীতির একটা ভীষণ অনিষ্ট হচ্ছে বিজ্ঞাপনের দ্বারা, এটা হচ্ছে আসুরীস্বভাবের। এটা মানুষকে মিথ্যে বলা শেখায়। সবার আগে এর খারাপ দিক হচ্ছে নিজেই নিজের প্রশংসা করা। এই তত্ত্বটি নিজেই সংস্কার বিরুদ্ধ। নিজের জিনিসের অপর লোক প্রশংসা করছে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হয় কিন্তু নিজেই তাকে বড়োসড়ো করে বলা এটা অশিষ্ট ও অনৈতিক। তারপর পুরো বিজ্ঞাপন শিল্প মিথ্যে ও অসংস্কারের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিজ্ঞাপন মিথ্যে জেনেও গ্রাহকরা ফেঁসে যান। ছোটো শিশু ও বোকা লোকও এর ছলনার শিকার হয়ে থাকেন। এর পাপও বৈশ্যবর্ণেরই হয়। বিজ্ঞাপনের জন্য বস্তুর মূল্য অধিক হয়ে থাকে এটাতো হচ্ছে আলাদা বিষয়। ব্যবসায়ীর আয়ের জন্য বিজ্ঞাপন, আর তার তুল্যমূল্য বোধ করতে হয় গ্রাহককে, এমনটা উলটো ভাবনা আজকাল সর্বমান্য হয়ে গিয়েছে। তৃতীয়ত, এতে মানুষের সৌন্দর্য দৃষ্টির হানি ঘটছে। দূরদর্শনের পর্দায়, রাস্তার ধারে, দেয়ালে, পত্রপত্রিকায় সবখানেই গাদা গাদা বিজ্ঞাপন দেখা যায়। এতে সুরুচি ভঙ্গ হয়। যেখানে চোখ পড়বে সেখানে যে কোনো বিক্রিযোগ্য বস্তুর সঙ্গে নারীর চিত্রবিচিত্র ভঙ্গিমার চিত্র দেখা যায়। মনোরঞ্জন শিল্পও জ্ঞানকে মানুষের মোহাবিষ্ট রেখেছে। সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, সিনেমা, ধারাবাহিক ও অন্যান্য রিয়েলিটি শোগুলি মানুষকে ভুল পথে চালিত করবার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। মানুষের শরীরের গরিমা, শিল্পের পবিত্রতা, মনের সুস্থতা ইত্যাদি সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে। দিনের পর দিন কলার ক্ষেত্র নিম্ন থেকে নিম্নতর হয়ে চলেছে। এতে সংস্কারের ক্ষয় দ্রুততার সঙ্গে ঘটছে।

আনন্দ, প্রেম, সদ্ভাব, সংস্কার, সেবা, পরিচর্যা, পথনির্দেশ, সাহায্য শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্ম, সবকিছুই বিক্রয়যোগ্য হয়ে গিয়েছে অথবা বিক্রয়যোগ্য বস্তুতে পরিণত

করা হয়েছে। শিল্পী, শিক্ষক, ধর্মগুরু চিকিৎসক সবাই বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়েছে বৈশ্যরা একে বিক্রয়যোগ্য করে দিয়েছে। এতে সমাজের অধঃপতন না হলেই বরং আশ্চর্যের বিষয়। মানুষ স্বয়ং বিক্রয়যোগ্য হয়ে পড়েছে।

অন্ন, জল, ওষুধ, বিদ্যাকে বিক্রি করা হচ্ছে ঘোর সাংস্কৃতিক সংকট। দানের প্রবৃত্তি লাভ-ক্ষতি বিচার করে হওয়াও অসংস্কারের লক্ষণ। আর্থিক লেন-দেনে অনীতি করা কোনো পাপ নয়, কারও দুর্বলতার সুযোগে লাভ নেওয়ায় কিছু ভুল নেই এমনটা বলা এবং করাও নিঃসঙ্কোচে হচ্ছে।

সমাজের উপযোগিতা দেখে উৎপাদন হওয়া উচিত, এটাই রীতি। কিন্তু এখন কম পরিশ্রমে, কম পুঁজিতে, কম সময়ে অধিক থেকে অধিক অর্থার্জন হোক এভাবে উৎপাদন করা হচ্ছে এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে চাহিদা বাড়ানো হচ্ছে। এর অর্থ হলো সমাজের সঙ্গে অন্যায় করা।

সমস্ত পৃথিবীকে এবং জীবনের সমস্ত গতিবিধিগুলেকে বাজার রূপে দেখা আজকের বৈশ্যদের একমাত্র সূত্রে পরিণত হয়েছে। সব বিষয়ই বাজারীকরণ করে দেওয়া হয়েছে। ভারতে সব কথারই ভিত্তি হচ্ছে পরিবার ভাবনা, কিন্তু এখন পরিবারও বাজারের মতো চলছে।

ঋণ করা, আয়ের চেয়ে অধিক ব্যয় করবার জন্য উৎসাহিত করা, অনাবশ্যক বস্তুদ্বারাপূর্ণ ঘরকে প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পরিণত করা ইত্যাদি সবকিছুতে আর্থিক ক্ষেত্রের অনিষ্টই হচ্ছে।

ব্যবসার ক্ষেত্রে বিদেশি নিবেশ, বহুরাষ্ট্রীয় সংস্থা ও লোভে বিদেশি ঋণ গ্রহণ, বিদেশ বাণিজ্য এসবকিছুর মধ্যে দেশের সমৃদ্ধির বিচার করলে পর খুব ভীষণ সংকটের রূপেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আবার এর মাঝেও অনেক প্রকার ঘুষের প্রভাব চলে থাকে।

আর্থিক ক্ষেত্রের ভ্রষ্টাচারে পৃথিবী খারাপভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাকে স্বীকার করে চলছে এবং ভ্রষ্টাচারকেই শিষ্টাচার বলা হচ্ছে।

সমাজে ব্রাহ্মণ এখন শ্রেষ্ঠ নয়। বৈশ্য

শ্রেষ্ঠ এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে এবং বৈশ্যরা তা স্বীকার করে নিয়েছে। একে অন্যভাবে বললে বলতে হয় যে সমাজ এখন ধর্মাধিষ্ঠিত নয়, বরং অর্থাধিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে। আজ বৈশ্য বর্ণের জন্য এই হচ্ছে অবস্থা।

শূদ্র বর্ণ :

আজ যে রকম বৈশ্য বর্ণের দাপাদাপি চলছে সেইরকমই শূদ্র বর্ণের অন্য প্রকারে দাপাদপি রয়েছে। শূদ্রের কাজ হচ্ছে পরিচর্যা করা। পরিচর্যার অর্থ হচ্ছে সেবা করা। সেই ভিত্তিতেই কাপড় পরিষ্কার করা, চুলকাটা ইত্যাদিও হচ্ছে পরিচর্যার কাজ। এগিয়ে গেলে সমস্ত কারিগর বর্গই শূদ্রবর্ণের মধ্যে সমাবিষ্ট আছে। একটা পরিভাষা এটাও দেওয়া হয়ে থাকে যে, সজীব থেকে সজীব প্রস্তুত করা তো হচ্ছে বৈশ্যের কাজ, কিন্তু নির্জীব থেকে নির্জীব বস্তুর উৎপাদন যে করে সে হচ্ছে শূদ্র। এই অর্থে কৃষক হচ্ছে বৈশ্য, কিন্তু কাঠুরে অথবা কামার হচ্ছে শূদ্র। এভাবে আজ অনেক বড়ো সমাজ শূদ্র বর্ণের হয়ে গিয়েছে।

শূদ্ররা বস্তুর সৃষ্টি করে। বৈশ্য তার ব্যবস্থা করে থাকে। উভয়ে মিলে সমাজকে সমৃদ্ধ করে থাকে। এই দৃষ্টিতে শূদ্র বর্ণের গুরুত্ব অনেক। কোনো সমাজই শূদ্র বর্ণ ছাড়া বাঁচতে পারে না। তথাপি শূদ্র বর্ণকে নীচু ভাবা, অত্যন্ত অন্যায়। কিন্তু আমাদের সমাজ এমনটা করেছে এবং শূদ্র বর্ণকে অনেক অপমানিত করেছে। এর পরিণাম হয়েছে অনেক মারাত্মক। আমরা আবার তাতে অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন জুড়ে দিয়েছি। এতে করে বিষয়টা আরও জটিল হয়ে গিয়েছে।

যদিও নিজেকে বর্ণশ্রেষ্ঠ বলেন, তথাপি ব্রাহ্মণরা নিজেকে শূদ্রেই পরিণত করেছেন। আর্থিক সুরক্ষা হচ্ছে শূদ্রের অধিকার। আজ ব্রাহ্মণও আর্থিক সুরক্ষাই খুঁজে থাকেন। এজন্য তাদের ব্যবহার শূদ্রের অনুরূপ

সংরক্ষণের বিষয়টাও সমাজের সাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। মানা হয় যে, শূদ্র গরিব, দলিত এবং শোষিত। বাস্তব চিত্রটা ভিন্ন। শূদ্ররা কারিগর হয়ে থাকেন। তারা বস্তুর নির্মাণ করেন। কারিগর সর্বদা সমৃদ্ধই হয়ে থাকে। কারিগর দ্বারাই সমাজ সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভারত কারিগরি ক্ষেত্রে বিশ্বে অনন্যসাধারণ স্থান রাখতো। লোহার নির্মাণ হোক অথবা সিমেন্টের, বস্ত্রের নির্মাণ হোক অথবা অলংকারের, বস্তুর নির্মাণ হোক অথবা ভাস্কর্যের— ভারতের কারিগরগণ বিশ্বে অদ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠা শূদ্রের কারণেই হয়েছিল। কিন্তু অস্পৃশ্যতার কারণে কারিগররা নিজেকে শূদ্র বলা ত্যাগ করল। আজ সংরক্ষণের নীতি গ্রহণের এদের অনগ্রসর বলা হয়ে থাকে। এরাও আর্থিক সুরক্ষার লোভে তা স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু এই শব্দাবলীই ভীষণ গোলমেলে। ভারতে বর্ণকে নিয়ে কখনও অগ্রসর অনগ্রসর বলে বিন্যাস করা হয়নি। নীতি নির্ধারকদের বিপরীত বুদ্ধিতেই এই শব্দ প্রয়োগ করে নিরর্থক ও অনর্থক বাদবিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। সকল বর্ণেরই নিজ নিজ দায়িত্ব রয়েছে আর তদনুসারে তার মাহাত্ম্যও হয়েছে। যেমন ব্রাহ্মণ বর্ণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্যরত রয়েছে, তেমনি শূদ্রবর্ণ ভৌতিক বস্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে কার্যরত। জীবন যেমন জ্ঞান বিনা চলে না, তেমনি ভৌতিক বস্তু ছাড়াও চলে না। দুটোই অনিবার্য। দুটোরই সমান মাহাত্ম্য। একটা সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে, অন্যটা হচ্ছে সংস্কৃতির। সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি সঙ্গে সঙ্গেই চলা দরকার। তবেই ভালো সমাজ জীবন চলতে পারে এই তথ্যকে ভুলে যাবার এবং ভুলিয়ে দেবার কারণে অনেক অনর্থ হয়েছে। আমাদের এই অনর্থকে সমাপ্ত করে পুনরায় সুস্থিরতা আনার প্রয়াস করা উচিত।

(ক্রমশ)

ভাষান্তর : সূর্য প্রকাশ গুপ্ত
প্রাক্তন অধ্যাপক

কৃষকদের বিভিন্ন নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্যই নতুন কৃষি আইন

চেতন ভগত

যে আইনগুলি পরিবর্তনপন্থী হিসেবে আনা হয়েছে তার মধ্যে কিছু পরিবর্ধন পরিমার্জন করা যেতেই পারে। তা যে নিখুঁত তা নাও হতে পারে। কিন্তু এই পরিবর্তন বা সংস্কারকে আমরা সার্বিক পরিস্থিতিতে অবশ্যই সমর্থন করব। আমাদের জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সর্বদা একটি পরিবর্তনমুখী সংস্কারের মানসিকতা থাকা জরুরি।

নতুন কৃষি আইনে আনা পরিবর্তনগুলি ভীতিপ্রদ হলেও আমাদের এই ব্যবস্থা চালু করতেই হবে। কেননা, যে কোনো মানুষকে যদি জিজ্ঞেস করা যায় ভারতীয় কৃষকের আর একটু ভালো অবস্থা হওয়া উচিত ছিল কি? সকলেই বলবে যে হ্যাঁ, অবশ্যই। আমাদের জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ কৃষিকাজ করলেও তাদের মোট অবদান জিডিপি-র মাত্র ১৮ শতাংশ। এর থেকে বোঝা যায় আমাদের কৃষকরা গড় ভারতীয়দের তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে গরিব। এটা আবার ভাবতে হবে এমন পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে ভারত সার্বিকভাবেই একটি কম আয়ের দেশ। উদাহরণ স্বরূপ চীনের মাথাপিছু আয় যেখানে বাৎসরিক ১০ হাজার ডলার, সেখানে ভারতের মাত্র ২ হাজার ডলার। এটা প্রমাণ করে ভারতের কৃষকরা বিশেষভাবে গরিব। সেই কারণে পরিবর্তন ও সংস্কার নিতান্তই জরুরি যাতে তাদের আর্থিক উন্নতি হয়। কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি আশু প্রয়োজন যাতে তা বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক ও পণ্যগুলি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। বাস্তবে কিন্তু এটা না হওয়ার কোনো কারণ নেই। যদি সুইজারল্যান্ড বা ফ্রান্সের চিজ বিশ্বের নামজাদা ব্র্যান্ড হতে পারে, সেক্ষেত্রে ভারতের দুগ্ধজাত সামগ্রীগুলি কেন পারবে না। আবার যদি কলম্বিয়ার কফি বিশ্বপ্রিয় হওয়ার ক্ষমতা ধরে, ভারতের কৃষিজাত বহু উৎপাদন কেন পারবে না।

অন্যতম যে বাধার কারণে ভারতের কৃষি, কৃষিজাত পণ্য ও কৃষকদের আয় পিছিয়ে পড়ছে তার কারণ প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি। মানুষের জীবনেও এটা সত্যি। আমরা সকলেই বহু ক্ষেত্রে পরিবর্তন চাই কিন্তু বাস্তবে তার মুখোমুখি হতে ভয় পাই। চিরাচরিত ব্যবস্থার সঙ্গে চলতে আমরা এক ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি। আর পরিবর্তন মানেই নতুন কিছু, অপরিচিত ও অনিশ্চিত। বহু মানুষ যে কাজ করে তা নিয়ে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সে তৃপ্ত নয়। ভেতরে ভেতরে সে বদল চায়। কিন্তু বর্তমানের কাজটি তাকে নির্দিষ্ট বেতন, কিছু আনুষাঙ্গিক সুবিধে এবং জীবন সম্পর্কে এক ধরনের কল্পিত নিরাপত্তা দেয়। এখান থেকে নতুন কিছু করতে যাওয়াটা হয়তো অনিশ্চয়তা ও বিপদ ডেকে আনতে পারে। এই কারণেই গরিষ্ঠাংশ মানুষ গয়ংগচ্ছ অর্থাৎ চলে যাচ্ছে অবস্থা ভালোবাসে। তারা ভবিষ্যৎহীন চাকরিতেই আটকে থেকে নিম্নমানের জীবনযাত্রায় কাটিয়ে দেয়। এই পরিবর্তন ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার লড়াই একটি চিরকালীন মনুষ্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শুধু ব্যক্তি মানুষ নয়, এই ধরনের ব্যাহারিক মানসিকতা বহু সংগঠন, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এমনকী অনেক ক্ষেত্রে একটা গোটা জাতির ওপরও বর্তাতে দেখা যায়। যে কোনো মানুষকে প্রশ্ন করুন, ভারতে কি বহু ক্ষেত্রে পরিবর্তন দরকার? উত্তর পাবেন হ্যাঁ নিশ্চয়। হায়! সেই পরিবর্তন যেই একটু দেখাবেন, দেখবেন ওই লোকগুলি দিল্লি যাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ করে বসে পড়েছে। কখনও ভাববেন না এটা বলছি কৃষকদের অসম্মান, করতে বা আরও বহু লোক যারা এই আইনের বিরোধিতা করে চলেছে তাদের অনুভূতিতে আঘাত দিতে।

দিল্লিতে এখন ভীষণ ঠাণ্ডা। একথা

কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে নিজের বিশ্বাসের ওপর কতটা নিশ্চিত হলে তবেই এমন কামড় দেওয়া ঠাণ্ডার সঙ্গে লড়াই করে দিনের পর দিন রাস্তায় শুয়ে জীবন বিপন্ন করা যায়। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে এই নতুন আইন তিনটি কৃষিকে বিভিন্ন নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য। বর্তমানে কৃষকরা তাদের পণ্য সরকার অনুমোদিত মান্ডিতে বিক্রি করে। তারা একটা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পায় (এমএসপি) যা তাদের কিছুটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এই ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগী বা ফড়েদের সংখ্যা অজস্র। সারাবিশ্বের সঙ্গে তুলনায় ভারতীয় কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। তবুও তারা এর মধ্যেও টিকে আছে।

নতুন আইনে কৃষক যে কোনো ক্রেতার সঙ্গে দেশের যে কোনো স্থানে বা বিদেশে নিজের মনমতো দামে তার ফসল বিক্রি করতে পারবে। দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি চাষে যোগ দিতে পারবে। তার জমি কখনই কোনো চুক্তিকারী কিনে নিতে বা অন্য অধিকার ভোগের স্বত্ত্ব পাবে না। সোজা কথায় চাষি খোলাবাজারে তার মাল বেচতে পারবে। এর ফলে সে তার ফসল বিক্রি করে দীর্ঘমেয়াদে অনেক বেশি লাভবান হবে যা অন্য যে সমস্ত ক্ষেত্রে সংস্থার হয়েছে সেখানের প্রত্যেকটিতে দেখা গেছে।

তাহলে এই বড়ো ধরনের পরিবর্তনটি কি একটু ভীতিপ্রদ? হ্যাঁ, তা বলা যেতেই পারে। এক্ষেত্রে কি কোনোও নিতান্ত খারাপ পরিস্থিতি কোনো সময় উদ্ভূত হতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্যই চাষি খোলাবাজার পেতে পারে কিন্তু অবস্থা এমন হতে পারে যে পণ্যের দরদাম নির্ধারণে সে তার ইচ্ছেমতো ভূমিকা নিতে পারছে না। হয়তো দরকাষাকষি করার কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই, ফলে বেসরকারি ক্রেতারা তাদের শোষণ করছে। এই চরম পরিস্থিতির আশঙ্কাই নতুন আইন সম্পর্কে আতঙ্কের জন্ম দিচ্ছে। এটাও ঠিক যে এই ভয় হয়তো অমূলক নয়। সব থেকে খারাপ পরিস্থিতির আশঙ্কাও ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বদা চরম পরিস্থিতিকে নির্ণায়ক শক্তি ধরে নেওয়াটা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। অবশ্যই আইনগুলির মধ্যে কিছু আলোচনার দাবি রাখে, কিছু ধারা হয়তো কিছুটা পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষ। কিন্তু তাই বলে তিনটি আইনি সংস্কারকেই সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া আদতে ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পশ্চাদপসরণ। আমরা প্রাজ্ঞভাবে বলে থাকি আমরা সংস্কার চাই। কিন্তু তা কার্যকর করতে গেলেই তাকে সম্পূর্ণ আটকে দেওয়ার মধ্যে প্রাজ্ঞাতার কোনো পরিচয় নেই।

বড়ো প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে জীবনে স্থিতাবস্থা ও পরিবর্তনের এই বৈপরীত্যের আমরা মুখোমুখি হব কী করে? এক্ষেত্রে আমরা যে ভুলটা সবসময়ই করে থাকি তা হলো আমরা সব থেকে শ্রেয় ও কাম্য যে পরিস্থিতি আমাদের পরিবর্তন এনে দিতে পারে তার সঙ্গে সর্বাপেক্ষা খারাপ সম্ভাব্য পরিস্থিতির তুলনা করে থাকি। সকলে বলছে চলতি ব্যবস্থায় এমএসপি কৃষককে সর্বদা নিরাপত্তা দেয় (এটা সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা), কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় তাকে পুরোপুরি শোষণের মুখে পড়তে হবে (সর্বোচ্চ খারাপ অবস্থা)। দেখুন, সর্বাপেক্ষা কাঙ্ক্ষিত অবস্থার সঙ্গে আমরা সর্বাধিক খারাপ পরিস্থিতির তুলনা করলাম। এই ধরনের তুলনায় অভ্যস্ত হলে পরিবর্তন কখনও করা যাবে না। আগে বলা কোনোরকমে দিন কাটানো চাকরির সঙ্গে যে মানসিকতা (আরে, আমি কম হলেও মাইনেটা তো পাচ্ছি) আমি যদি ছেড়ে দিয়ে নিজের ব্যবসা শুরু করি সেটা মুখ থুবড়ে পড়তে পারে, সঙ্গে সঙ্গে আমি ধ্বংসও হয়ে যাব।

কিন্তু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভাবতে হয় বা তুলনামূলক পর্যালেচনা করতে হয় বর্তমান সবচেয়ে ভালো অবস্থার সঙ্গে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সব চেয়ে ভালো অবস্থার। এই সূত্র অনুযায়ী যদি নতুন আইনগুলি প্রয়োগ হয়— (১) বেসরকারি পুঁজি ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় বড়ো ভাবে ঢুকবে, যার ফলে পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি হবে। কৃষকেরা সর্বোচ্চ দামে মাল বিক্রি করে ধনী হয়ে উঠতে পারবে। ফড়েদের সরে যেতে হবে। এর ফলে উৎপাদন দক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে। ঠিক যেমন নগণ্য চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করলে তা ফুলেফেঁপে আগের থেকে আয় বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। আর যদি আপনি খারাপতম পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করতে চান সেক্ষেত্রে চলতি ব্যবস্থার ত্রুটিগুলিতে নজর রাখুন। চলতি অবস্থায় এমএসপি বহু ক্ষেত্রে খুব কম হয়ে যেতে পারে কিন্তু কৃষক সেই নীচু দামেই তার পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়। বহু ক্ষেত্রেই সে তার লগ্নি করা টাকা (চাষের খরচ) ওঠাতে না পেরে দেনায় ডুবে যায়। হ্যাঁ, বেশিরভাগ কৃষকই তাদের পণ্যের ক্ষেত্রে এমএসপি পায় না। একইভাবে ভবিষ্যৎহীন চাকরির ক্ষেত্রে যদি সময়ে তা ছেড়ে বিকল্প কিছু করা না যায় ক্রমে অল্প আয়ে খাদ্যাভাব থেকে স্বাস্থ্যভঙ্গ, মানসিক অবসাদ থেকে মাদকাসক্তিতে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এগুলো বিবেচনায় রাখলে চাকরি ছেড়ে নতুন কিছুর ভাবনা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয় কি? জীবনের ক্ষেত্রেও একটাই সত্যি যদি উন্নতি করতে হয়, এগিয়ে যেতে হয় তাহলে পরিবর্তনকে আঁকড়ে ধরতেই হবে। আর এর জন্য দরকার নিজের মনের ভয়কে জয় করা। আর মনে রাখতে হবে, এই পরীক্ষায় সব সময় সর্বাপেক্ষা ভালোর সঙ্গে সর্বাপেক্ষা পরিবর্তিত ভালোর তুলনা করতে হবে। সর্বনিম্নের সঙ্গে পরিবর্তিত সর্বনিম্নের। তবেই তুলনাটি যুক্তি সঙ্গত হবে।

যে আইনগুলি পরিবর্তনপন্থী হিসেবে আনা হয়েছে তার মধ্যে কিছু পরিবর্ধন পরিমার্জন করা যেতেই পারে। তা যে নিখুঁত তা নাও হতে পারে। কিন্তু এই পরিবর্তন বা সংস্কারকে আমরা সার্বিক পরিস্থিতিতে অবশ্যই সমর্থন করব। আমাদের জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সর্বদা একটি পরিবর্তনমুখী সংস্কারের মানসিকতা থাকা জরুরি। ▮

সংবিধানে অদ্ভুত বৈপরীত্য, বাংলাদেশে ইসলামি শক্তির উত্থান

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। বাংলাদেশের সংবিধানে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য আছে। চার মূল নীতির অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষতা, আবার ইসলাম হলো রাষ্ট্রধর্ম। একাত্তরে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর পাশে দাঁড়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনী, মিত্রবাহিনী রূপে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার এই লড়াইয়ে ত্রিশ লাখ মানুষ শহিদ হয়, চার লাখেরও বেশি নারী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আল বদরদের হাতে সম্ভ্রম হারায় কিংবা নিহত হয়, অনেকে আত্মহত্যা করে। বাহাত্তর সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে চার মূল নীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয় গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র।

পরবর্তী সময়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর প্রথমে তাঁরই সহযোগী, হত্যাকাণ্ডের নায়ক খন্দকার মোশতাক ক্ষমতা গ্রহণ করেন। পৌনে তিন মাসের মাথায় তাকে সরিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান। তিনি ক্ষমতা নিয়েই সামরিক ফরমানে তড়িঘড়ি সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করেন, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা পাল্টে ইসলামি ধারায় আনেন, সমাজতন্ত্রের অর্থ পরিবর্তন করেন। সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' স্থাপন করেন। মূলত ইসলামিকরণ শুরু হয় এভাবেই। সংবিধানের এই পরিবর্তনগুলো পরে সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদে পঞ্চম সংশোধনী হিসেবে পাশ করা হয়। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর পরাজিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে

আত্মসমর্পণ করার পর পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী ইসলামি দলগুলো এবং রাজাকার, আলবদর বাহিনী আত্মগোপন করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর এরা বেরিয়ে আসে।

অবশ্য সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব পাকিস্তানে ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন, যদিও আওয়ামি লিগে এ নিয়ে মতভেদ হয়েছিল। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করেন। কিন্তু মুজিব সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেননি, আর এই সিদ্ধান্ত দেশে ইসলামি শক্তিগুলোকে প্রাণ দিয়েছিল। এছাড়া শেখ মুজিব ইসলামি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এই দুই সিদ্ধান্ত সমালোচিত হলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে বড়ো প্রতিবাদ হয়নি।

জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হওয়ার পর কয়েক মাসের ব্যবধানে আরেক সেনাপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামিকরণের যে সূচনা করেছিলেন, ১৯৮৮ সালে এরশাদ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করে তারই পূর্ণতা প্রদান করেন। সে সময় শেখ হাসিনা ছিলেন বিরোধী নেতা, তিনি অষ্টম সংশোধনীর প্রতিবাদ করেন। দেশে হরতাল আহ্বান করা হয়। বিএনপিও দায়সারা প্রতিবাদ জানিয়েছিল। অবশ্য অষ্টম সংশোধনীর দুটো অংশ ছিল, রাষ্ট্রধর্ম ও হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ। এ নিয়ে রিট হয়, সর্বোচ্চ আদালত সংশোধনীর হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ অংশটি বাতিল করে। কিন্তু অষ্টম সংশোধনীর রাষ্ট্রধর্ম অংশ বহাল থাকে। সাংবিধানিক অনাচার ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আঘাত করার প্রতিবাদে সংখ্যালঘু হিন্দু বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হন, গঠিত হয় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সালে নির্বাচনের খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসেন। প্রধান বিরোধী দল ছিল আওয়ামি লিগ। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসেন শেখ হাসিনা, তখন বিএনপি প্রধান বিরোধী দল। কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম বাতিল হয়নি। ২০০১ সালে আবার বিএনপি ক্ষমতায় আসে। এর পর ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিরতার পর ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিন চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসেন শেখ হাসিনা। এর মধ্যে এরশাদের সঙ্গে শেখ হাসিনার সমঝোতা হয়, যা আজো অব্যাহত রয়েছে। এই সমঝোতার অংশ হিসেবে এরশাদের জাতীয় পার্টি সংসদে প্রধান বিরোধী দলের আসনে রয়েছে। সরকারে আওয়ামি লিগ সেই তিন চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে।

ইতোমধ্যে উচ্চ আদালতের রায়ে পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হয়, জিয়াউর রহমান ও এরশাদের সেনাশাসন অবৈধ ঘোষিত হয়। এ ব্যাপারে সংসদে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়। আওয়ামি লিগ সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনে সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে। কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম বহাল থাকে। এরশাদ ও ইসলামি

শক্তির আস্থা হারানোর ভয় ছিল।

দুই

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হচ্ছে আগামী বছর। গত পাঁচ দশকে কার্যত রাজনীতির হাত ধরেই সমাজে একাত্তরে পরাজিত পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগীরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং আজ রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় চলে এসেছে। ইসলামি আলেম-ওলামাদের ফতোয়াকে সমীহ করে চলতে হচ্ছে রাজনীতিকদের।

রাজনীতির যে চরিত্র দাঁড়িয়েছে, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ক্ষমতায় থাকার জন্য ও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগীদেরই হাত ধরতে হচ্ছে। জিয়াউর রহমান একাত্তরের হত্যাকারীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেন, তাদের নিয়েই বিএনপি গঠন করেন। এরশাদও একই পথ অনুসরণ করেন। গঠন করেন জাতীয় পার্টি। অন্যদিকে সেনাশাসকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে গিয়ে আওয়ামি লিগ ও বিএনপি উভয়েই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগীদের নেতৃত্বাধীন ইসলামি সংগঠনগুলোর দ্বারস্থ হয়। মুক্তিযুদ্ধ কার্যত গৌণ বিষয়ে পরিণত হয়।

যে জামায়াতে ইসলামি পাকিস্তানি বাহিনীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিল, যাদের তৈরি করা ঘাতক বাহিনীর আল বদর, আল শামস ও রাজাকার বাহিনী দেশজুড়ে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, বিজয়ের দুদিন আগে দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে বাংলাদেশকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য, তাদের কদর বেড়ে যায় সব রাজনৈতিক দলের কাছে। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে আওয়ামি লিগ বিএনপির সঙ্গে মিলে জামায়াত সরকার গঠন করে। আজও এই জোটে রয়েছে জামায়াত। যদিও যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের বিচার শুরু হয় ২০১২ সালে, বেশ কয়েকজনের ফাঁসিও হয়। জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠলেও আজও নিষিদ্ধ হয়নি।

কওমি মাদ্রাসা ভিত্তিক আরেক বড়ো ইসলামি সংগঠন হেফাজতে ইসলাম, যাদের অনেক শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগী হিসেবে কাজ করার অভিযোগ রয়েছে, ২০১৩ সালে ঢাকায় সরকারবিরোধী বড়ো সমাবেশ করার পরও আওয়ামি লিগের সঙ্গে সমঝোতা হয়। শেখ হাসিনা হেফাজতে নেতাদের গণভবনে ডেকে নিয়ে আপ্যায়িত করেন, তাদের দাবিদাওয়া মেনে নেন। হেফাজতের ১৩ দফা দাবি অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামিকরণ করেন, রবীন্দ্রনাথ-সহ অনেক হিন্দু কবি-লেখকদের লেখা পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দেওয়া হয়। কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে ডিগ্রিকে সাধারণ শিক্ষার মাস্টার্স ডিগ্রির সমমান করা হয়। অর্থাৎ কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে ডিগ্রি নিয়ে তারা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসতে পারবে, প্রশাসনে যোগ দেবে।

আজ বাংলাদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপন ও ভাঙচুরের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে, তার সূচনা করে জামায়াত ও হেফাজতে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলন-সহ অন্যান্য ইসলামি দলগুলো। গোড়ার দিকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সামনে থেকে বাউল ভাস্কর্য সরিয়ে নেওয়া হয় তাদের দাবি মেনে। সুপ্রিম কোর্টের সামনে স্থাপিত ন্যায়বিচারের প্রতীক গ্রিক ভাস্কর্য অপসারণের দাবি করা হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই দাবির সঙ্গে একমত হন। ভাস্কর্য সরিয়ে নেওয়া হয়। এভাবেই হেফাজতে জামায়াত ও অন্যান্য ইসলামি দলগুলো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ভাস্কর্য ও মূর্তি এক দাবি করে বাংলাদেশকে ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক পরিচালনার আন্দোলনে নেমেছে। কওমি মাদ্রাসাগুলোতে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না রচয়িতা হিন্দু বলে। এ ব্যাপারে সরকার কড়া ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

এভাবেই শক্তি সঞ্চয় করেছে ইসলামি দলগুলো। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকায় হেফাজতে ইসলামের ফ্রান্স বিরোধী বিক্ষোভে জড়ো হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। ফ্রান্সের পণ্য বর্জন ও দূতাবাস বন্ধের দাবি জানানো হয় সমাবেশ থেকে। অথচ চীনে শিজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলমানদের অধিকার হরণ করেছে সরকার, তাদের নামাজ- রোজা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে কোথাও কোনো প্রতিবাদ হয়নি, মিছিল হয়নি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ইসলামপন্থী দলগুলো এখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বিষয় নিয়েও কথা বলছে।

আওয়ামি লিগ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সাধারণ শিক্ষার চেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষায় বরাদ্দও বেড়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় ইস্যু নিয়ে ইসলামি দলগুলো সাধারণ মানুষের কাছে অবস্থান তৈরির সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে। বিশ্লেষকরা আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটকেও তাদের শক্তি বৃদ্ধির পেছনে বড়ো কারণ হিসেবে দেখেন। ইসলামি রাজনীতির শক্তিবৃদ্ধির কারণ হিসেবে বিশ্লেষকরা আরও বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কাজের জন্য বাংলাদেশিদের যাওয়ার সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ফলে ওই দেশগুলোর সঙ্গে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর একটা প্রভাব একেবারে গ্রামাঞ্চলের মানুষের মাঝে পড়েছে। তাদের চিন্তাচেতনায় গভীরভাবে কাজ করছে।

২০০৪ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ক্ষমতাসীন ২০ দলীয় জোটের শরিক এক ইসলামি দলের নেতা প্রায়ই জনসভা করে স্লোগান দিতেন, 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান'। ক্ষমতাসীন জোটের পক্ষ থেকে কেউ আপত্তি করেনি। আওয়ামি লিগের কোনো নেতা প্রতিবাদ করেননি। বর্তমান সরকারের অনেক নেতাই গর্বের সঙ্গে দাবি করেন, তাদের সময়ে মসজিদ- মাদ্রাসার উন্নয়ন হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামি দলগুলো যে শক্তি সঞ্চয় করছে, সেটা আওয়ামি লিগের মধ্যে অনেকে স্বীকার করেন। সেজন্য তারা অবশ্য বিএনপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। আর বিএনপির পাল্টা অভিযোগ আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে। তৃতীয় শক্তি জাতীয় পার্টি ইসলামের পরম সেবক বলে গোড়া থেকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। দলের প্রতিষ্ঠাতা এরশাদ মুসলমানদের মন পেতে রবিবারের সাপ্তাহিক ছুটি বদলে শুক্রবার করেন জুমার দিন বলে। রেড ক্রশের বাংলাদেশ অংশের নাম পরিবর্তন করে ইসলামি মতে নামকরণ করেন রেড ক্রিসেন্ট। পরবর্তী সময়ে আওয়ামি লিগ বা বিএনপি ক্ষমতায় এলেও সাপ্তাহিক ছুটি পরিবর্তিত হয়নি।

এখন রাষ্ট্রধর্ম বাতিলের দাবি শুধু হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ▮

মোদী সরকারের বিরোধিতার জন্যই কৃষক আন্দোলন

সম্প্রতি রাজধানী দিল্লিতে ভারতীয় প্রাদেশিক কৃষকদের আন্দোলন অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। দেশের কোনও কৃষককে খাটো না করে কতগুলি কথার জন্য এই পত্রের বতারণা।। আন্দোলনে অধিকাংশ কৃষকই পাগড়ি পরা। অনুমান করা যায় তাঁরা পঞ্জাবের কৃষক। আচ্ছা বলুন তো, পঞ্জাবে এনডিএ সরকার নেই বলেই বিরোধীদের উস্কানি কাজ করছে না তো? আসলে দেশের বেশিরভাগ কৃষকই সেই অর্থে অল্পশিক্ষিত। তাই তাদের সহজেই বিভ্রান্ত করা যায়। মোদী বিরোধীরা কৃষকদের আন্দোলনে নামিয়ে তাদের কর্মদিবস কেন নষ্ট করছেন? দেশের সরকার বলছে কৃষিবিল কৃষকদের স্বার্থ-সুরক্ষিত করবে, আর বিরোধীরা বলছে কৃষকস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। ধরে নেওয়া হলো এই কৃষি আইনে পঞ্জাবের কৃষকদের ক্ষতি হবে। শুধুমাত্র দু-একটা রাজ্যের কৃষকদের আপত্তির কারণে দেশের আইন বাতিল করতে হবে? এটা কী ধরনের কথা? বিরোধীরা শুধুমাত্র মোদী-বিরোধিতার কারণে কৃষক আন্দোলন সমর্থন করছেন। মোদীর জনপ্রিয়তা ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের সময়ও দেশ দেখেছে। ভোটের ফলাফল বিরোধীদের হতাশা ছাড়া কিছুই দেয়নি। আবার দেশের ৬০ ভাগ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। তাদের সমর্থন ছাড়া এনডিএ ৩৫৩টি আসনে জিততে পারত কি? বিরোধীরা তাহলে কাদের বিরোধিতার নামে কৃষকদের রাস্তায় নামিয়েছেন। কৃষক প্রতিনিধিরা যখন সরকারের সঙ্গে আলোচনা করল, তখন তাদের হয়ে কেন কিছু প্রতিনিধি আলোচনায় গেলেন না? মুখোশটি খসে পড়বে বলে? গণতন্ত্রে আলাপ-আলোচনার রাস্তা তো খোলা থাকে! আসলে রাজনৈতিক প্রাদেশিক স্বার্থের কারণেই এই কৃষক আন্দোলন।

—**বিশ্বজিত ঘোষ,**
কৃষ্ণনগর, নদিয়া।

কৃষি সংস্কারের প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমানে দেশের অন্যতম আলোচিত বিষয় হলো কৃষি সংস্কার বিল। সম্প্রতি বিলটি সংসদে পাশ হয়েছে। এই বিলের পক্ষে বা বিপক্ষে বিভিন্ন মতামত আছে। তাই একটু এই বিলটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই বিল নিয়ে আলোচনার আগে কিছু তথ্য তুলে ধরা যেতে পারে। বর্তমানে দেশের একশত তিরিশ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ কোটি মানুষ সরাসরি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে প্রায় তিরিশ কোটি মানুষ প্রান্তিক কৃষকের পরিবারের অন্তর্গত। এই প্রান্তিক কৃষকের জমির পরিমাণ মোটামুটি পাঁচ থেকে সাত বিঘা ও গড় আয় বছরে প্রায় আশি থেকে নব্বই হাজার। অর্থাৎ এই প্রান্তিক কৃষকের আয় বর্তমান বাজারের নিরিখে খুব কম তাই প্রান্তিক কৃষকরা এতদিন ভালো ছিলেন একথা বলা যায় না। দেশের মোট গ্রাম প্রায় ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এবং দেশে মান্ডি বাজারের সংখ্যা প্রায় সাত হাজার। অর্থাৎ দেশের মোট গ্রামের তুলনায় মান্ডিবাজারের সংখ্যা নগণ্য। কিছু কিছু ফসল দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হিমঘর। কিন্তু দেশের হিমঘরগুলির সিংহভাগই আছে হরিয়ানা, পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে । অন্য রাজ্যে প্রয়োজন অনুপাতে হিমঘর নেই। অর্থাৎ দেশের কৃষকরা খুব ভালো আছেন তা আমরা বলতে পারি না।

এইবার চলে আসি দ্বিতীয় বিন্দু অর্থাৎ এত দিনের কৃষি আইন এপিএমসি আইন ১৯৫২ নিয়ে। এই আইনে কৃষক তার উৎপাদিত ফসল সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত কিছু ফড়ের কাছেই বিক্রি করতে পারতো, অন্যত্র বিক্রি করতে পারতো না। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কৃষক ফসলের সঠিক দাম পেত না। এই প্রসঙ্গে একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের একটি মন্তব্য উল্লেখ না করে পারছি না যার অর্থ একজন প্রেসিডেন্সি বা যাদবপুরের উচ্চশিক্ষিত ছাত্রকে যদি বলা হয় যে তিনি বড়োবাজার ছাড়া অন্যত্র চাকরি করতে পারবেন না, তবে সেই ছাত্র বা ছাত্রী কিন্তু তা মেনে নেবেন না। তাহলে কৃষকরা মানবেন কেন?

এইবার বর্তমান আইন নিয়ে আসি। এই আইনে চারটি স্তম্ভ আছে। কৃষক, সাধারণ মানুষ, সরকার, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা। এই আইন অনুযায়ী কৃষক তার উৎপাদিত ফসল তার ইচ্ছেমতো যে কোনো স্থানে বিক্রি করতে পারবেন। এছাড়াও পূর্বে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনে সরকার হিমঘরের শস্য যে কোনো সময় অধিগ্রহণ করতে পারতো— যার সংস্কার বর্তমান আইনে রয়েছে। যখনই কর্পোরেট সংস্থাগুলি সরাসরি কৃষকের থেকে ফসল কিনবে তখন কিন্তু কৃষকের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যাবে কারণ যে কোনো কৃষিভিত্তিক শিল্পের কাঁচামাল কিন্তু কৃষকদের কাছেই আছে। ফলে কৃষিভিত্তিক শিল্প, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আলুর চিপ্স , আমের আচার প্রস্তুত ইত্যাদি প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ বিকল্প কর্মসংস্থান বাড়বে। ফসলের পচে যাওয়া বন্ধ হবে ও হিমঘর বৃদ্ধি পাবে। এবার আসি যারা এতদিন কোরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের কী হবে, কারণ তাদেরও পরিবার আছে। যখন কোনো কর্পোরেট সংস্থা একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ফসল কিনবে তখন কিছু লোকের প্রয়োজন হবেই। যারা কৃষক ও সংস্থার ব্যক্তিদেরই এ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও ইমার্কেটিং কৃষকদের কাছে একটি ভালো উপায় ।

তাই এই বিল যথাযথ বাস্তবায়িত হলে কৃষকের আর্থিক উন্নতি সম্ভব ও কৃষকের উন্নতিই ভারতের মতো দেশের আর্থিক উন্নতির সহায়ক হবে।

—**রাহুল চক্রবর্তী,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

রামমন্দিরের জন্য ভারতবাসীর গর্ব হওয়া উচিত

অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের আর

কোনওপ্রকার বাধা রইল না। অনেকে এটাকে হিন্দুদের জয় বলে প্রচার করছে। বেশিরভাগ মুসলমানই মনে মনে ক্ষুব্ধ। কিন্তু মুখে কিছু বলছে না। সেকুলারবাদীরাও কিছু বলতে পারছে না যেহেতু এটা কোর্টের সিদ্ধান্ত। তাই প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছে না। কিছু কিছু মুসলমান নেতা তো এটাকে মুসলমানদের পরাজয় বলে মনে করছে। কিন্তু এই রায়কে যদি হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সকলের জয় বলে মনে করি তাহলে কি এটাকে ভুল বলা হবে? ব্যাপারটা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে জাহিরুদ্দিন শেখ বাবর পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। তারপর তার সেনাপতি বাকি খাঁর তত্ত্বাবধানে রামমন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করে যার নাম বাবরের নামানুসারে দেওয়া হয়, যা আজকের তথাকথিত বাবরি মসজিদ। ওটা শিবমন্দির ছিল না রামমন্দির ছিল না রাজপুর রাজার প্রাসাদ ছিল সেটা তর্কের বিষয়। যতদূর জানি সম্রাট বিক্রমাদিত্য ভগবান রামচন্দ্রের জন্মস্থানের ব্যাপারে অনুসন্ধান করেন। তার পর এই স্থান ভগবান রামচন্দ্রের জন্মস্থান বিবেচনা করে রামজন্মস্থান মন্দির নির্মাণ করেন। যখন বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করেন তখন মুসলমান বা ইসলামের সৃষ্টি হয়নি। এখানকার জনগণ হিন্দু না হলে বৌদ্ধ বা জৈন ছিলেন। পরে মুসলমান শাসনে অত্যাচারে বা স্বেচ্ছায় মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিল। কিছু কিছু বহিরাগত মুসলমান যে এদেশে আসেনি তা নয়। তাদের ঔরসজাত ব্যক্তিরা এদেশের লোকেদের সঙ্গে বিবাহ বা দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এদেশের বাসিন্দা বা মুসলমান হয়ে গেছে। সুতরাং এদেরও রক্তে হিন্দুর রক্ত বা ভারতীয় রক্ত বিদ্যমান। অপর পক্ষে ভগবান রামচন্দ্র তারও বহুপূর্বে এদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য কিছু কিছু সেকুলারবাদী বা পশ্চিমি পণ্ডিতরা রামচন্দ্রের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাদের কথা ধরে নিলেও বলা যায় মহাভারতের যুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব নবম ও দশম শতাব্দীতে সংগঠিত হয়েছে। ভগবান রামচন্দ্র তারও অনেক আগে ত্রেতাযুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় শ্রীরামচন্দ্র এই উপমহাদেশের সকলেরই পূর্বপুরুষ। তাদের মধ্যে অনেক জবরদস্তির ফলে বা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়েছে। সুতরাং হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন সকলেরই পূর্বপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র। সুতরাং রামমন্দির নির্মাণ হওয়াতে তাদেরও আপত্তি থাকার কথা নয় বরং আনন্দিত হওয়ার কথা। সুতরাং মুসলমানদের দুঃখ বা হতাশ হওয়ার কোনও প্রকার কারণ দেখি না। রামমন্দির নির্মাণে সকল ভারতবাসীর গর্ব হওয়া উচিত।

—কমল মুখার্জী,
ধরমপুর, চুঁচুড়া, হুগলি।

গোষ্ঠীকোন্দলে কোণঠাসা তৃণমূল

পূর্বের অভিজ্ঞতা সম্বল করে এনডিএ সরকার সম্ভবত ধরে নিয়েছিল যে, কৃষি আইনও বিনা বাধায় বলবৎ করে ফেলা যাবে। কিন্তু কৃষি আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ যে এমন পর্যায়ে পৌঁছোবে তা ভাবতে পারেনি তারা। উলটে এই আন্দোলন আর পাঁচটা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের চেয়ে যে সম্পূর্ণ আলাদা একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে প্রবল বিপাকে পড়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকার মনে করেছিল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে জোর ধাক্কা খাবে এ কৃষক বিক্ষোভ। কিন্তু ঘটনাক্রম থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এ সমস্যা সহজে মেটার নয়। কারণ চাষিদের হাতে এখন অঢেল সময়। আপাতত তাদের আর চাষের কাজ নেই। কারণ সর্ষে ও গম ইতিমধ্যেই বোনা হয়ে গেছে। পরবর্তী চাষাবাদ শুরু হবে ২০২১-এর এপ্রিল মাস নাগাদ। প্রয়োজনে ততদিন তাঁরা রাজপথে বসে থাকবেন। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলি কৃষককে ভুল বুঝিয়ে সমস্যা আরও জটিল করে তোলার চেষ্টা করেছেন। কৃষকদের এই অনড় মনোভাব বিজেপি সরকারের রক্তচাপ বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট। কারণ এমন চ্যালেঞ্জের মুখে কখনও পড়তে হয়নি কেন্দ্রের এনডিএ সরকারকে। প্রকাশ থাকে যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তাই এ রাজ্যে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে মাটি কাঁমড়ে বসে আছে বিজেপি নেতারা। এদিকে দলের কেন্দ্রীয় স্তরের নেতারা এসে এ রাজ্যে 'পদ্ম' ফে ফোটাতে ব্যস্ত। এমতাবস্থায় দিল্লির রাজপথের কৃষক বিক্ষোভের জের এ রাজ্যে এসে পড়লে তা যে বিজেপির পক্ষে অত্যন্ত শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে তা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না। একদিকে যেমন বিজেপি দলের কেন্দ্রীয় স্তরের নেতাদের এ রাজ্যে ঘনঘন আনাগোনা ও নানা কর্মসূচি নেওয়া এবং দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির ফলে রাজ্যের শাসক শিবিরের রাতের ঘুম কেড়েছে। অন্যদিকে তেমনি শাসকদলের গোষ্ঠী কোন্দল ও নানা দুর্নীতির অভিযোগ এবং দলের সংগঠনের এমন নড়বড়ে টালমাটাল অবস্থা নিঃসন্দেহে ভাবাচ্ছে তৃণমূল নেতৃত্বকে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এইরকম, ডামাডোল পরিস্থিতির সুযোগ সিপিএম ও কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধীরা মাঠে নেমে পড়েছে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, রাজ্যের এমন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে রাজ্যের জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে এবার হয়তো এ জঙ্গলরাজের অবসান ঘটালেও ঘটাতে পারে বলে মনে করছেন।

—মহাবীর প্রসাদ টোডি,
ইসলামপুর। উঃ দিঃ

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

SURYA

MADE IN INDIA
LIGHTING | APPLIANCES
FANS | STEEL & PVC PIPES

AATMA NIRBHAR BHARAT KI PEHCHAN

SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@surya.in | www.surya.co.in | suryalighting surya_roshni
Tel: +91-11-47108000, 25810093-96 | **Toll Free No.: 1800 102 5657**